Kolpolipi- 1st Year

কল্পলিপি

প্রথম বর্ষ

কল্পলিপি

প্রথম নববর্ষ - ২০২৩

শুভ প্রকাশ

দুর্গাপুর , ৫ই জুন, ২০২৩

সম্পাদকীয় দপ্তর

"কল্পমানস ফাউন্ডেশন", সারদাপাল্লি , দুর্গাপুর - ৭১৩২১৩, পশ্চিম বর্ধমান।

মুঠোফোন: ৮৯০০০০০৯৬৪

ইমেলঃ kolpolipi@gmail.com

উপদেষ্টামন্ডলী

শ্রীমতী প্রতিভা রায়, শ্রী মুকুন্দ কুমার রায়, শ্রী কৌশিক রায়, শ্রী অর্ণব মৈত্র

প্রধান সম্পাদক

শ্রী চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীমতী পায়েল রায়

মুখবন্ধ

সৌভিক ঘোষ

প্রকাশক

কল্পমানস ফাউন্ডেশন

Some pictures of different activities of Kolpomanos Foundation

On the way to plantation July, 2022

Distribution of Saplings, July 2022

Saplings for Urban Gardening

Plantation activity August, 2022

Distribution of Saplings to Kolkata

Plantation on Biodiversity Day, 2023

Distribution of Saplings, July 2022

Distribution of Saplings,Earth Day 2023

Earth Day Campaign, Benachity, 2023

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৫। মুখবন্ধ ৬। অভিজিৎ দত্ত ৭। অদ্রিজা চ্যাটার্জি ৮। অলক্তিকা চক্রবর্তী ৯। ডা: অলোক মজুমদার ১০। চাতক পাখি ১১। অঞ্জনা চক্রবর্তী ১২। অন্তরা সরকার ১৩। অন্তরা সিংহরায় ১৪। অরিজিৎ ঘোষ ১৫। বিক্রম শীল ১৭। চঞ্চল মন্ডল ১৮। চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯। গোবিন্দ মোদক ২১। মেমসাহেব ২২। ঝর্ণা মুখোপাধ্যায় ২৩। কাকলি গুহ রক্ষিত ২৫। কৌশিক চট্টোপাধ্যায় ২৬। কৌশিক রায় ২৭। মিলন সরকার ২৮। মিঠু মুখার্জি ২৯। মৃন্ময় ভৌমিক ৩০। নিমাই বন্দোপাধ্যায় ৩১। নীরেশ দেবনাথ ৩২। নির্মল কুমার প্রধান ৩৩। নীতা কবি মুখার্জী ৩৪। রঘুনাথ সিনহা ৩৫। রাজশ্রী সেন ৩৬। রীতা রায় ৩৭। সব্যসাচী মুখার্জি ৪১। সমৃদ্ধি ঘোষ ৪২। সঞ্জীব দোলুই ৪৩। শিপ্রা ব্যানার্জি ৪৫। শিপ্রা ব্যানার্জি ৪৭। স্মিতা ঘোষ ৪৮। সোমনাথ ব্যানাজ্জী ৪৯। সোমেশ ব্যানার্জী ৫৩। সোনালী সাধু ৫৪। সৌভিক ঘোষ ৫৫। শ্রাবণী মুখার্জী ৫৬। সুমিতা চৌধুরী ৫৯। স্বপন কুমার ধর ৬০।।

সম্পাদকীয়

আমাদের কল্পলিপি পত্রিকা পরিবেশ ভিত্তিক অর্থাৎ পরিবেশকে কেন্দ্র করে মানুষের চিন্তা ভাবনা পরিকল্পনা নিয়ে এই পত্রিকার প্রকাশ। মানুষ সহ সমস্ত জীবকুল একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে, সেখানে লালিত পালিত হয়ে বড় হয় এবং সেখানেই মৃত্যু। তাই প্রত্যেকের জীবনে শুধু মা বাবা অথবা নিজের রোজগার বা শিক্ষার জন্যই আমরা বড় হই না বা সুস্থ থাকি না এর পশ্চাতে পরিবেশের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ অসুস্থ হলে আমরাও অসুস্থ হয়ে পড়বো। তাই পরিবেশ সংরক্ষণে দায়-দায়িত্ব এবং কর্তব্য আমাদের যথেষ্ট রাখতে হবে ।

আমাদের চারিদিকে যা কিছু আছে-আকাশ মৃত্তিকা নদ-নদী অরণ্য পর্বত নগর জনপদ সহ অন্যান্য সকল জীবজন্তু নিয়ে আমাদের পরিবেশ । এই পরিবেশ প্রাকৃতিক নিয়মে ভারসাম্য বজায় রেখে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের আশ্রয় দেয়, তাদের ভার বহন করে, বৃদ্ধি ও জীবনধারণের জন্য খাদ্য সরবরাহ করে, চলাফেরা ও বংশবিস্তারে সাহায্য করে। তাহলে এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদকে আমাদের অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে শিল্প উৎপাদনে কলকারখানার সৃষ্টি, নানান যুদ্ধ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগ হওয়ায় এই পরিবেশ অত্যন্ত দূষিত হয়ে পড়ছে। ফলে আমরা নানান সমস্যার সম্মুখীন দৈহিক ও মানসিকভাবে। তাই শুধু সরকারি বা অন্যান্য সংগঠনের ওপর সব দায় দায়িত্ব না চাপিয়ে আমরা কবি সাহিত্যিকেরা একটু করে কাজ করলেই পরিবেশকে সুস্থ রাখতে পারি। এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের কল্পলিপি পত্রিকা, সুতরাং সবাই আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে এগিয়ে আসুন এবং সহযোগিতা করুন। কারণ পরিবেশ সংরক্ষণ একার দ্বারা সম্ভব নয়। বৃহৎ কিছু পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এই কাজে নামিনি, সামান্য ছোটখাটো কাজের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাইছি। আপনাদের সহযোগিতা পেলে তার সার্থক রুপায়ন সম্ভব। কল্পলিপি পত্রিকার প্রথম প্রকাশন সেরূপ ধরা বাঁধা নিয়মের মধ্যে করছি না কিন্তু পরের প্রকাশন গুলি অবশ্যই পরিবেশ কেন্দ্রিক লেখা নিয়েই এগিয়ে যাবে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে, পরিবেশের কাজকর্মের জন্য আমরা " কল্পমানস ফাউন্ডেশন " নামে একটা ট্রাস্টি তৈরি করেছি। সেই কল্প মানস ফাউন্ডেশন এর বার্ষিক পত্রিকা হলো কল্প লিপি।

ধন্যবাদান্তে
চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রধান সম্পাদক

মুখবন্ধ

এই একবিংশ শতাব্দীতে দাড়িয়ে একথা দৃঢ় ভাবে বলাই যায় যে মানুষ অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক এবং পরস্পরবিরোধী মানসিকতার বশবর্তী হয়ে পড়েছে। মানবজাতির অস্তিত্বের ভিত্তি, পরস্পরকে সাহায্য করা এবং একত্রে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে জীবনধারণ করা, একথা জনসাধারণ আজ ভুলতে বসেছে। একাকীত্বের সমুদ্রে ভাসমান মনুষত্বের নৌকাটিকে টিকিয়ে রাখার জন্যই আজ আমাদের এই সংস্থাটি উদ্যোগী হয়েছে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগে।

প্রত্যেক মানুষের, বিশেষত যুবসমাজের উচিৎ এই জাতীয় কর্মে নিজেদের নিযুক্ত করে আবার সেই আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা এবং আধুনিক সমাজব্যবস্থায় নিঃস্বার্থভাবে অপরের পাশে দাড়ানো।

আজকাল পরিবেশের খেয়াল রাখা, গাছ লাগিয়ে তার সঙ্গে একটা "সেলফি" তুলে সেটাকে চোখের নিমেষে social media তে সবার সামনে তুলে ধরার মধ্যেই সীমিত থেকে গেছে। কিছু দিন পর থেকে, গাছটার যত্ন নেওয়া বা তাতে জল দেওয়া, এসবের কিছুই মনে থাকে না, অথচ, সেই গাছের সঙ্গে তোলা ছবিতে কতগুলো লাইক পড়েছে সেটা নিয়মিত খোঁজ রাখা হয়।

এসবের মাঝে একটা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি...

আসলে অনেকে তো মাতৃভাষায় কথা বলতে লজ্জা পান। শুধু বাংলা বলে নয়, যে কোনো মাতৃভাষাই যে প্রতিটি মানুষের গর্বের বিষয়, সেটা আজকালকার উচ্চ status এর মানুষজন শুনলে হয়তো লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবেন না, তথাকথিত উচ্চ সমাজে। বলাই বাহুল্য, এধরনের মানসিকতার পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে মাতৃভাষার প্রতি আমাদের যে কৃতজ্ঞতা বোধ, তা হয়তো আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে।

সব মিলিয়ে, পরিবেশ, বাঙালি এবং মানবসমাজকে তাদের নিজ নিজ হারানো গৌরব ফিরিয়ে দিতে আমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে, এবং একে অপরকে সাহায্যর সঙ্গে সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে একতা খুঁজে, জীবজগতের শ্রেষ্ঠ প্রজাতির তকমাটার যথাযথ মর্যাদা বজায় রাখতে হবে।

পরিবেশ দিবস

অভিজিৎ দত্ত

আসছে ৫ই জুন
বিশ্ব পরিবেশ দিবস
ঘটা করে হবে পালন
মঞ্চে শুরু হবে বক্তৃতা ও ভাষণ
এতে কী সবাই হবে
পরিবেশ সচেতন?

পরিবেশের সঙ্গেই জীবের জীবন
ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত
পরিবেশের ক্ষতি হলে
জীবের ক্ষতি হবে ততো।

গরমের সময় মাত্রাতিরিক্ত গরম
ঠান্ডার সময় অতিরিক্ত ঠান্ডা
আবার হঠাৎ,হঠাৎ প্রবল ঝড়ে
প্রকৃতি চারপাশকে লন্ডভন্ড করে।
ভেবে দেখেছো কী এই ব্যাপারটা?
কত ক্ষতি হলে পরিবেশের
ঘটে এই বিপর্যয়টা।

আবার বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে
হিমবাহ গলছে দ্রুত
অল্প কিছুদিন পর মনে হয় পৃথিবীটা
জলের তলায় চলে যাবে দ্রুত।
তখন মানুষের বেঁচে থাকাটাই
মুশকিল হয়ে পড়বে ততো।

তাই ঘটা করে পরিবেশ দিবস
পালন করার সাথে সাথে
পরিবেশ বান্ধব হতে হবে সকলকে।
বিদ্যালয়স্তর থেকে এগিয়ে
আসতে হবে প্রত্যেককে।
সরকারকে করতে হবে বছরভর
প্রচার ও সচেতনতা ।

A Departure-Forever

Adrija Chatterjee

In the glimmering light of dusk,
I have wandered along the quite and deserted city lanes
By the flickering street light for hours,
Sometimes interrupted by any unknown cry
That came from far away over the houses but not to call me back further.
I have stayed awake till late at night waiting in vain for the appeal
That would call me to bed drowsing occasionally in the molten gold
But fading candlelight, curled under a warm blanket with eyes made heavy by sleep,
And I listened to the huffing breeze
Rustling the frostbitten old ivy leaves
That had stealthily crawled up along the window panes
And at times I heard the mournful cry
Of a lonely fox from the dark woods that echoed breaking
The eerie silence of the night.
At dawn, I have seen the little gleam drops
Of silvery dew that had descended from the pellucid sky and angel-white clouds
And fallen on the blades of the lawn grass like chains of pearl.
But then, when the morning sir dances
In a deluge of melody
Played by the choir of birds from the lush green canopies and prayers of pure ablution
From distant temples and churches resonates through the town,
The first glimpse from my half awaken eyes charioted by *Oizys* lands
On the clock against the black walls of my room only to proclaim
The arrival of another day without you
And to remind me that my love wasn't enough to summon you
Back to me.

তখনও মায়াটুকু লেগে

অলক্তিকা চক্রবর্তী

দাওয়ায় উঠে ডাকলাম, 'রাঙাকাকু...'
আড়ায় তক্ষক সাড়া দিল শুধু

ঢোলকলমির বন উজাড় করে
উঠে এলো শিরশিরে বাতাস

হা-ক্লান্ত জানলা দরজার লুটোপুটি
উদাস মনমরা কাঠবিড়ালির ক্লান্তি থেকেই
এলোমেলো যেন সবকিছু

একরাশ শূন্যতায় চোখ সইয়ে খুঁজতে গেছি
গোলঘর আনাচ কানাচ ঘটিবাটির তেপান্তর

একটা বিশ্বাসের কাছে একটা গন্ধের দরবারে তবু চিরঋণী

খুঁজতে থাকি বাদবাকি আমি টাকে.

এলোভেরার ফুল

ডা: অলোক মজুমদার

দিনের প্রথম পেশেন্ট টি দেখার পর হাত ধোবার সময় একদম অকারনেই ডা: দেবকান্তির মনে হল, আচ্ছা সেই ফুলগুলোর কি হয়েছিল? ফুটেছিল? টবের এলোভেরা র ফুলগুলো? দেবকান্তি মনে করতে পারলেন না। খচখচ করতে থাকল কথাটা।

দেবকান্তি, বাড়ির ব্যপারে খুব বিশেষ খবর রাখেন না। সত্যি বলতে কি এ ব্যপারটা কে উনি একটু তাচ্ছিল্য ভাবেই দেখেন। তাঁর কথা হলো, প্রফেশনাল লোকদের এসব দিকে নজর দেওয়াটা উচিত ই না। এই যে আজ, এই মফ:স্বল শহরের মত জায়গায়, উনি এমন সফল প্র্যাকটিশনার, কলকাতার যেকোন কাউকে টেক্কা দিতেই পারেন, এর কারন উনি সংসার কে প্রাইয়োরিটি দেওয়ার আদিখ্যেতা টা দেখাননি কোনদিন।যাই হোক।

সেদিন কোন কারনে চেম্বার বন্ধ রাখতে হয়েছিল হঠাৎই। ব্যালকনিতে ব্রেকফাস্ট এর সময় তিথি দেখিয়েছিল এলোভেরার গাছটায় লম্বা একটা ডাঁটি গজিয়েছে, তাতে ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়ি। দেবকান্তি খুব অবাক চোখে দেখেছিলেন সেই কুঁড়ি-ফুল। কবে যে তিথি লাগিয়ে গেছ্‌ল, কবে যে এসব হল!!

দেবকান্তির সেদিন বেশ কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল, যেটা তাঁর ধাতে নেই।

পরদিন তিথি চলে গেছ্‌ল। যাবার আগে বলেছিল, " গাছটার দিকে খেয়াল রেখো। বেশি জল খায় না এ গাছ। চিন্তা নেই। কিন্তু ফুল আসছে তো, তাই বলছি।"

দেবকান্তির ছেলে স্টেটস-এ। স্ত্রী তিথি কলকাতায় থাকে, নিজের বুটিক নিয়ে মেতে। মাসে- দু মাসে আসে, নিজের দু নম্বর সংসার ঠিকঠাক করে চলে যায় ফের।

তারপর তো এই গাছ।

দেবকান্তি র মনে পড়ল, তিথি চলে যাবার পর আর গাছ টা কে দেখাও হয়নি। "Very bad", দেবকান্তি নিজে নিজেই বল লেন, ...

বেশ কিছুদিন পর সুদূর বিদেশে রাতে শুয়ে শুয়ে দেবকান্তির ছেলে একটু অবাক হয়ে ই বাবার করা একটা মেসেজ রিসিভ করেছিল.....

..... স্নেহের খোকা, আমি আর তোর মা বেড়াতে যাচ্ছি- পুরুলিয়ায়, তোর জ্যেঠুমনি দের ওখানে। ওখান থেকে গড়পঞ্চকোট যাব। তোর মনে পড়বে না, ছোট্টবেলায় গেছ্‌লি তুই। এখন আমরা ট্রেনে, আসানসোলের কাছে।

খোকা, আমি চেম্বার কমিয়ে দিয়েছি। বরং, এখন তোর মার কাছেই আমি যাই। শনিবার করে। তোর মার বুটিক টা খুব চলে।

এবার খুশি তো খোকা?.....

না। ফুলগুল ফোটেনি। দেবকান্তি সেদিন বিকেলে চেম্বার থেকে ফিরে ব্যালকনিতে গিয়ে দেখেন শুকিয়ে ঝরে গেছে এলোভেরার ফুলগুলো। গাছ্‌টাও এর পর বাঁচেনি।

তিথি তবু ফটো পাঠাতে বলেছিল।

....ফটো দেখে..... তিথি কোন জবাব দেয় নি।

দেবকান্তির মনে তিথির সেই কথাগুলো বেজে উঠেছিল,....." কিন্তু ফুল এসেছে তো, তাই বলছি,"...

জীবনে কখন একটি প্রাণ পূর্ণতা চায়, কখন কেউ অব্যক্ত অস্ফূটে ও একটু ভালোবাসা আশা করে, সে প্রেমে, সে আকাঙ্ক্ষায় সামান্যতম তাচ্ছিল্যও কত যে আঘাত দেয়, তা সে ক্ষুদ্র তৃণ হোক, বা পাশের মানুষই হোক, সফল ডাক্তার দেবকান্তি সেদিন প্রথম তা অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিলেন।

সেদিন সেই সন্ধ্যা আসা ব্যালকনিতে নগণ্য একটি গাছের অপূর্ণতা যেন একটি মানুষের জীবনের দোর খুলে দিল।

অক্সিজেন

চাতক পাখি

আমায় কে না চেনে ,
সবাই জানে
হয়তো গুরুত্বও বোঝে ।

কিন্তু ওই উদাসীনতা ,
না দেখার ভান এই ভাবনায় বলীয়ান
-"আমি কেনো নেবো দ্বায়িত্ব নিজে।

আছে তো আরো পাঁচ জনে ,
তারাও তো দেখি
কাঁচা ঘর পাকা করে।

গাছ কেটে আসবাব গড়ে,
আর আনে তুলে যত্নে
আর্টিফিসিয়াল গাছ ঘরে।

ঘরের ভিতর কেমন
চাকচিক্য বজায় রাখে
রৌদ্র এলেও লেতিয়ে পড়ে না ।

এক ঋতু গেলে এলেও
তার কিছু যায় আসেনা ,
কেননা সেতো পাতা ঝরায় না ।

সকাল হলেই অগণিত
পাখিদের তাড়া নেই
অযথা কেউ ফুল ও ফল ছিড়ে না।

ছোট ছোট শিশুদের দুষ্টুমিওপনাও নেই,
তাই কেউ আর গাছ লাগাই না
তাই আমায় আর কেউ খোঁজ করে না ।

তবে আমি কেনো শুধু শুধু আর
সখের বাগান গড়ে রাখি
জায়গা খান জড়া করে ।

কেননা আমিও যে চাই
থাকতে তাদের মত সুউচ্চ ইমারত বাড়িতে
বদ্ধ দেয়াল ইঁটের ঘরে।"

তাই জানি কেউ আমায় আর পাত্তা দেয়না ,
নাই দিক ক্ষতি নেই ,
বুঝবে সেদিন !

যেদিন হবে সেও এক মুমূর্ষ রুগী
রবে আটকা পড়ে বদ্ধ ঘরে, চাই একটু অক্সিজেন!
বুঝবে সেদিন আমায় না পাত্তা দেওয়া
করেছে কতটা ক্ষতি প্রতিদিন।

হতাম যদি একটা আস্ত গাছ

অঞ্জনা চক্রবর্তী

হতাম যদি মস্ত বড়ো গাছ
মহীরুহ বলতো কি মানুষ?
ছাল বাকল মাটি গর্ভে মূল
বুনছে প্রাণ পরিবেশে কুরুশ।

হতাম যদি আস্ত এক গাছ
মূল ও শিকড়ে নিতাম ফসফরাস
ফুরিয়ে আসা পৃথিবীতে অক্সিজেন
দিতাম ঢেলে স্নিগ্ধ শান্তি বাতাস।

বাড়িয়ে দিয়ে সবুজ সমাহারে
ফুল ফল প্রকৃতি মায়াজালে
দিতাম এনে স্বর্গ থেকে --পারিজাত
নাচতো শ্বাস রঙিন তালে তালে।

তড়িৎ এসে পড়তো আমার গায়ে
বাঁচতো জীবন চলা ফেরা ঝড় জলে
পুড়িয়ে আমি দিতাম তাকে জীবন
ভালোবাসা বনবীথির স্বরে।

হতাম যদি একটা বড়ো গাছ
অরণ্য হতো সঞ্জীবনী বুটি
আমার তলে আসে যেন সেই পথিক
সবাই যেন পায় জীবন -খুঁটি।

ফিরিয়ে দাও অরণ্য

অন্তরা সরকার

কচি শিকড়টা প্রতিনিয়ত দুর্যোগের যাপন চিত্রে,
আলোর উদাত্ত অনুদাত্তে এপার ওপার,
দীপ্ত দাহ, বর্ষায়, দুঃসাহসিক স্পর্ধায়,
বিস্তৃত শাখা প্রশাখা, ফলফুলন্ত সম্ভার।
লোভী বাজ, শকুনের চাকচিক্য বাড়ে,
ধারালো কুঠারে আঘাত হানে বুকে
সবুজ বনানীর বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না ভঙ্গুর পদক্ষেপে।
গহীন অরণ্য বিসর্জনে সুদৃশ্য অট্টালিকা,
নির্লজ্জতা পশুদের নয়, ব্যভিচারীর নির্মমতায়,
রুক্ষ স্বর কোমলতা হারায় শিউরে অন্তরাত্মা,
শিমুল ,পলাশ বিসর্জনে অসাড় বিবেক সত্তা।
ভুমি কেঁপে ওঠে, কাঁপে বসুন্ধরা, নির্মমতা দেখি,
এই মান ও হুঁশ মহান সাজে,সভ্যতা হয় মেকি!

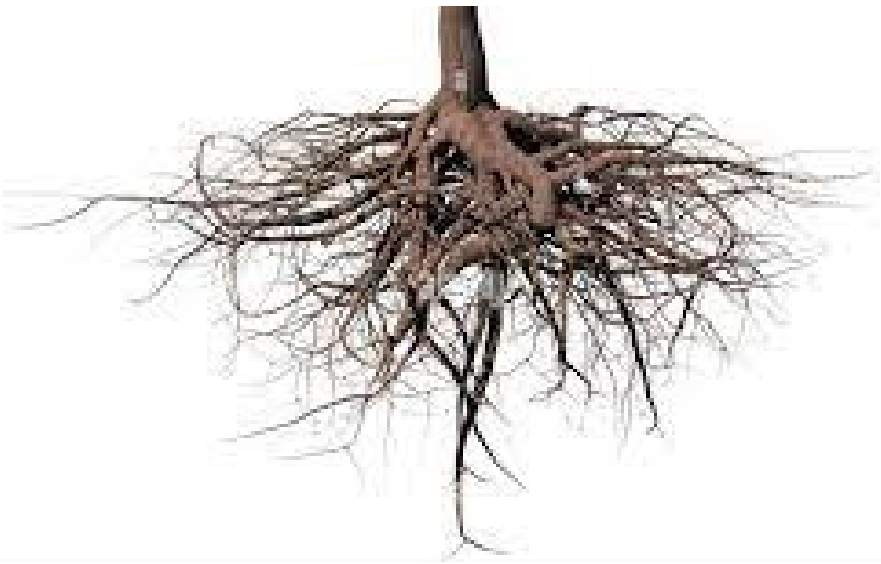

কবি ও কল্পনা

অন্তরা সিংহরায়

একদিন কবির সুরে মিশে যাবে
আমার হাজার গানের স্বরলিপি ,
পদ্যপাতায় তখন নির্জন রাতের চাঁদ,
ছন্দেরা ভোগে অন্ত্যমিলের জ্বরে
হাতের ঘামে ভিজছে কবিতা শরীর
ছড়াদের বুক ধুকধুক আলাপী সুর
কবি কী ভুলেছে সেই অষ্টাদশীর কথা !
সুরের থেকে দূরে যেতে হার মেনেছে!

কবির বুকে দগ্ধ প্রেমের এক সভ্যতা
এক শতকে শূন্য মনে নিংড়ে পথে
হাহুতাশে মরছে বুঝি তার কবিতা!
আগুনে জ্বলে আগুন জ্বলে
পুড়ছে বুক , জ্বলছে কলম।
কবির সাথে কল্পনার এই যুগলবন্দি
কখনো অধিকরণ আর কখনো শুধুই মরণ।

প্রেম দিবস ও ভালোবাসা

অরিজিৎ ঘোষ

আমি এখন মস্ত প্রেমিক,চুটিয়ে প্রেম করি,
মনে আছে দিনটাযে আজ,চোদ্দ ফেব্রুয়ারি।
প্রেম দিবসের ইংরেজিটা,ভ্যালেনটাইন ডে,
প্রেম করেনি এমন মানুষ,আছে বলুন কে!?
মস্ত প্রেমিক,আস্ত প্রেমিক,সস্তা প্রেমিক আছে,
মনের মানুষ খুঁজতে গিয়ে,নিজের মতো বাছে।
ভীতু প্রেমিক,লাজুক প্রেমিক,হরেক রকম পাবে,
দুরন্ত প্রেম করতে গিয়ে,মায়ের ভোগে যাবে।
চাপা প্রেমে,ফাঁপা প্রেমে,নানান রকম হ্যাপা,
মনের মানুষ না পেয়ে ভাই,হয়েও গেছে ক্ষ্যাপা।
অবৈধ প্রেম এই নামেতেও,প্রেমের আছে চলন,
পরকীয়া প্রেম গোপন ভাবে,আরও নানান ধরণ।
ছুটকো প্রেমিক প্রচুর পাবে,অস্থায়ী সব প্রেম,
প্রেমকে তারা মনেই করে,ফালতুই এক গেম।
সারা জীবন এঘাট ওঘাট,করেই শুধু মরে,
একটা ধরে,একটা ছাড়ে,অ্যাক্টিংটাই করে।
সারা জীবন হয় না তারা,খুশি কিংবা সুখী,
চাহিদাটা বড্ড বেশি,ধান্দা বহুমুখী।
ও হেনরির গল্প আছে,জিমি ভ্যালেনটাইন,
প্রেম যে মানুষ পাল্টে ফেলে,এক্সামপল্ ফাইন।
ডিভাইন লাভ মধুর বড়,শক্তি জোগায় মনে,
মনটাকে তাই জড়িয়ে ফেলে,ধনুক ভাঙ্গা পণে।
দারুণ ভাবে প্রেম জমলে,হয় তা প্লেটোনিক,
এখন সবই সেকেন্ড হ্যান্ডে,হয়েছে এঁটোনিক।
দুষ্ট স্বভাব অনেক আছে,জঘন্য হয় তারা,
যৌন সুখেই মগ্ন থাকে,প্রতারণায় সেরা।
ভ্যালেনটাইন ভ্যালেনটাইন,বড্ড মাতামাতি,
রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কাছে,এ তো মরা হাতি।
এই দেশেতে প্রেমের অভাব,একদমই নাই মোটে,
বিদেশি প্রেমে মাতোয়ারা,পেছন পেছন ছোটে।
তবুও এটা খুশির বিষয়,দোষ নেই খুব কোনো,
উৎসবেরই আপন দেশে,বিদেশি নেশা কেনো!?
বারো মাসে তেরো পাবণ,অভাব কিছুই নাই,
লুচি মিষ্টি ছেড়ে এখন,কেক পেস্ট্রিই খাই।
প্রেমের দেশ ভারত আমার,যান্ত্রিকতাও কম,
আমরা তবু ফরেন মালে,কষে লাগাই দম।

ভ্যালেনটাইন,নিউইয়ারে,প্রচুর মাতামাতি,
দেশি পরব মিইয়ে গেলো,হঠাৎ রাতারাতি।
ঝাঁচকচক হোটেল বারে,উদোম নাচানাচি,
কুঞ্জ প্রেমের কৃষ্ণ-রাধা,হয়েই গেছে বাসি।
ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে,ভ্যালেনটাইন স্পেশাল,
বাস্তবেতেও দেওয়া নেওয়া,গোলাপ নিয়ে বিশাল।
ভালোবাসায় ডুব দেওয়াটা,নয়তো খারাপ মোটে,
মনের মতো সঙ্গী সাথী,সঠিক যদি জোটে।
ভালোবাসার দিনটা এলো,সবাই ছিলো খুশি,
হঠাৎ করেই মৃত্যু মিছিল,ছিনিয়ে নিলো হাসি।
কালের চাকায় এই দিনটা,হলোও কালো দিন,
পুলওয়ামার ঐ রক্ত ধারার,শুধবে কিসে ঋণ।
ব্ল্যাক ডে নামে খ্যাত হলো,ভালোবাসার দিনটা,
খুশির আমেজ কেড়ে নিল,ভেঙ্গেও দিলো মনটা।
কলঙ্কেরি লাগলো কালি,কাপুরুষের কাজে,
অনেক জীবন কেড়ে নিলো,এই দিনটার মাঝে।
শহীদ হলো অনেক জওয়ান,ভিজলো রক্তে মাটি,
দেশের প্রেমিক এরাই ছিলো,প্রেমও ছিলো খাঁটি।
ভ্যালেনটাইন ডে এলে তাই,আর করি না ধুম,
সেনার চোখে নামলো যখন,চিরকালের ঘুম।
দিনটা আসে নিজের মতো,আর লাগেনা ভালো,
ভালোবাসা থমকে গিয়ে,দিন হয়ে যায় কালো।
বিশ্বজুড়ে ভ্যালেনটাইন,আসে নিজের মতো,
আমার দেশে গোলাপ ফুলে,রক্ত লেগে এতো।
ভুলতে পারি তাদের কথা? সীমান্তে ওই যারা,
সবার জীবন রক্ষা করে,ওই সেনারাই তারা।
দুঃখ সুখেই মিশে থাকে,ভালবাসার দিন,
প্রতিদিনই ভালোবাসো,হয়ো না বিবেকহীন।
ভালোবাসা,প্রেমের মাঝে,লুকিয়ে গভীর অর্থ,
সত্যি করে থাকে যদি,একটুও নাই স্বার্থ।

সত্যি করে ভালোবাসা,অনেক কঠিন কাজ,
সেখান থেকে যায় না ফেরা,পড়েও যদি বাজ।
হরেক রকম 'ইজিম' আছে,হরেক রকম 'বাদ',
সবখানেতেই জরুর আছে,কিছু না কিছু খাদ।
ভালোবাসাই কেবল শুধু,চিরকালের সত্য,
কাছে টানার মন্ত্র হলো,ভালোবাসাই নিত্য।
বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক,ভালবাসার গন্ধ,
হাতে মিলিয়ে থাকুক সবাই,বিভেদ,বিবাদ বন্ধ।
গোলাপ দিয়ে সবাইকে তাই,ডেকে নিও কাছে,
ভালোবাসা নানান রকম,যুক্তিও ঠিকই আছে।
সকল রকম ভালবাসাই,আত্মারই এক টান,
সকল ব্যথা যায় জুড়িয়ে,থাকলেই মন প্রাণ।
এসো সবাই হাত মিলিয়ে,থাকি সবার সাথে,
ভালোবাসার আদান-প্রদান,চলুক দিনে রাতে।
ভালোবাসার ভাগাভাগি,বৃথাই থাকে শর্ত,,
শুদ্ধতা আর পবিত্রতায়,মিটেও যাবে তর্ক।
এমনি করেই এই পৃথিবী,করতে হবে শুদ্ধ,
প্রেমের টানে,ভালোবাসায়,বন্ধ হবে যুদ্ধ।
সকল কিছুরই হয় সমাধান,থাকলে ভালোবাসা,
ভালোবাসায় শক্তি অনেক,জাগিয়ে রাখে আশা।
অনুভূতির নানান প্রকাশ,নানান রকম শাখা,
ভালোবাসার মূল অর্থ,একই সাথে থাকা।
যেভাবে হোক ভালোবাসা,সঙ্গী তোমার হোক,
লোকে তোমায় বাসবে ভালো,ভুলবে তোমার শোক।
ভালোবাসা দাম দিয়ে তাই,যায় না মোটেই কেনা,
ভালোবাসার ধরণ দিয়েই,যাবেও মানুষ চেনা।
ভালবাসাও চরম খারাপ,মিথ্যা যদি হয়,
সবের সাথে যায় যে লড়া,প্রতারনায় নয়।
এই কনসেপ্ট নিয়েই মানুষ,সারা জীবন বাঁচে,
জীবনটাকে ভোগ করে নেয়,ভালোবাসার আঁচে।

ভালোবাসা অরূপ রতন,ডুব দিয়ে হয় খুঁজতে,
যন্ত্রণাটাও অনেক বেশি,হয় যে তোমায় সইতে।
একটুখানি ভালোবাসা,ক্ষণিক সময় পেতে,
অনেক বছর পার হয়ে যায়,মহাকালের স্রোতে।
ভালোবাসা হয়তো জটিল,হয়তো অনেক সোজা,
সারা জীবনে চলতে থাকে,নিজের মতো খোঁজা।
ভালোবাসাই জীবন বাঁচায়,ডেকেও আনে মৃত্যু,
ভালোবাসাই বন্ধু বানায়,ভালোবাসাই শত্রু।
ভালোবাসাই সৃষ্টি করে,ভালোবাসাই ধ্বংস,
হার-জিতের এই জীবন জুড়ে,কমবেশি তার অংশ।
ভালোবাসার সঠিক,বেঠিক,বিষম গোলক ধাঁধা,
ভালোবাসার অমোঘ টানে,পড়তে হবেও বাঁধা।
যতই লিখি দিনে রাতে,হবেই না তাই শেষ,
ভালোবাসার হয় না তো শেষ,অনন্ত তার রেশ।

হারিয়ে যাওয়ার রূপকথা

বিক্রম শীল

একদিন সবাই দূরে সরে যাবে-
সরতে সরতে হয়ে যাবে দূর আকাশের তারা।
ভালোবাসা জড়ালে জাহাজের নাবিক-কে পথ দেখাবে ধ্রুবতারা হয়ে যাবে।
অবহেলায় খসে পড়বে কিনা খোঁজ নেওয়া হবে না।
যে নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি সে কি করে অন্য কারো স্বপ্ন পূরণে সফল হবে।
একদিন ভালোবাসার মানুষ হয়তো ভালো বাসাতেই হারিয়ে যাবে।

সলতে পাকানো প্রদীপ

চঞ্চল মন্ডল

পুরাতন কথাতে আর তেমন ব্যথা নেই,
ক্ষতের ব্যথাতে মলমের প্রয়োজন নেই।
সব কিছু যেন খসে খসে পড়ছে -
পোড়া বাড়ির পলস্তরার মতো।

তেমন ভাবে আর ক্ষোভ আসে না মনে ,
হালকা ভাবে মানিয়ে নিয়েছি নিজেকে।
সবই বয়ে গেছে সময়ের স্রোতে,
কিছু স্মৃতি নুড়ির মতন রয়েছে পড়ে।

কিছু গল্প শুনেছি লোকের মুখে,
সাজানো সংসারে এক নব বধূর।
আর এক সলতে পাকানো প্রদীপ -
মিট মিট করে জ্বলছে অল্প ধোঁয়ার সাথে।

পরিবেশ বাঁচাও

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশ কথাটির অর্থ কি? পরি অর্থ হলো চারিদিক এবং বেশ অর্থে শয্যা, উত্তম, চমৎকার। সুতরাং , পরিবেশ বলতে আমাদের চারিপাশ উত্তম চমৎকার ভাবে সজ্জিত থাকবে। আমাদের চারিপাশ বলতে আমাদের চারিদিকে যা কিছু আছে আকাশ-মাটি- বাতাস-জল-মাঠ সকল জীবজন্তু - রাস্তাঘাট ইত্যাদি সকল কিছুই । এই পরিবেশেই আমাদের জন্ম, জীবনযাত্রা এবং মৃত্যু । প্রত্যেকটি সজীব বস্তু-প্রাণী চায় সুস্থভাবে জন্ম নিয়ে সুস্থভাবে বেঁচে থেকে সুস্থভাবে মৃত্যু পর্যন্ত সকলের জন্য কিছু করতে । তাই পরিবেশকে আমাদের সুস্থ রাখতেই হবে । অসুস্থ পরিবেশে আমরা কখনোই ভালো কিছু করতে পারবো না।

প্রকৃতিগতভাবে পরিবেশ সাধারণত দুই প্রকার -- জড় এবং সজীব। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক। একে অপরের পরিপূরক। যেমন জল প্রাণহীন জড় পদার্থ অথচ জল ছাড়া সজীব জড় কারো অস্তিত্ব থাকতে পারে না । এই দুই পরিবেশের প্রত্যেকটি আবার দুইভাবে গঠিত -- একটি প্রকৃতিগতভাবে এবং অন্যটি মানুষের তৈরি অর্থাৎ গঠনগতভাবে পরিবেশ দুই প্রকার প্রাকৃতিক এবং অপপ্রাকৃতিক । এই দুই পরিবেশই মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে থাকে । তাই এই দুই পরিবেশ দূষিত বা অসুস্থ হলে মানুষের জীবনও অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোন পরিবেশ আপনা আপনি অসুস্থ হয় না। প্রাণীকুল তাকে অসুস্থ করে নিজে অসুস্থ হয় কারণ বিজ্ঞানী তো বলে গেছেন- প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। পরিবেশ দূষণ প্রধানত চার প্রকার - বায়ু দূষণ, জল দূষণ, শব্দ দূষণ এবং মাটি দূষণ । পরিবেশের প্রধান সম্পদ বায়ু। সেই বায়ু থেকে প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন ১৪ থেকে ১৮ কেজি বায়ু গ্রহণ করে ।এরপর অন্যান্য পশু পাখিরা আছে । যেখানে বায়ুতে অক্সিজেন যত বেশি থাকবে মানুষ সেখানে তত বেশি সুস্থ থাকতে পারবে। কিন্তু বায়ু দূষণ আজ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে । গাছ বায়ুতে অক্সিজেন সরবরাহ করে। একটি সুস্থ সবল বৃক্ষ প্রতিদিন তিন সিলিন্ডার অক্সিজেন সরবরাহ করে। কিন্তু মানুষ, নিজের স্বার্থে অপরিকল্পিতভাবে বায়ু দূষণে আমাদের পরিবেশের বৃহৎ অংশ দূষিত হয়ে বিশ্বের ভারসাম্য নষ্ট করছে।

আধুনিক সভ্যতার আরেক অভিশাপ জল দূষণ । নদী তীরবর্তী সমৃদ্ধ অঞ্চলের গ্রাম শহর কলকারখানা স্কুল কলেজ হাসপাতাল থেকে দূষিত পদার্থ নদনদীতে পড়ে জল ভীষণভাবে দূষিত হচ্ছে। সেই দূষিত জলের ব্যবহারে মানুষ সহ সমগ্র জীবন অসুস্থ হয়ে পড়ছে। পুকুর নদ-নদীতে সমুদ্রে বিভিন্ন ধরনের চাষে কীটনাশকের ব্যবহারে, বিভিন্ন যান চলাচলে বিষাক্ত তেলের ব্যবহারে সকল আধারের জল আজ দূষিত । ফলস্বরূপ ভয়ংকর দূষণের সম্মুখীন হচ্ছি আমরা।।

পরিবেশ দূষণের তৃতীয় ভয়ঙ্কর সমস্যা হল শব্দ দূষণ। প্রতিদিন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত মোটরগাড়ি, কলকারখান্ বাজি পটকা, রেডিও টিভি উৎসবের মাইক্রোফোন, মিটিং মিছিলের স্লোগান সহ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের লাউড স্পিকারের বিকট শব্দে বাতাস জল মাটি দেহ মন স্বাস্থ্য সকল কিছুই দূষণ রোগে আক্রান্ত । নির্জনতা নিস্তব্ধতা শিক্ষার একটি প্রধান মাধ্যম। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এই কারণে গ্রাম - শহরের লোকালয় থেকে এক প্রান্তে প্রতিষ্ঠা করা হতো কিন্তু এখন অজ্ঞান দুর্বুদ্ধির দাদাগিরিতে কেউ এইসব মানছে না। বিপরীত কুফল আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে।
এরপর মাটি দূষণ । যে মাটি থেকে আমরা আমাদের খাদ্যের ১০০ শতাংশ খাদ্য তৈরি করি ,যে মাটিতে নিরাপদ আশ্রয় নির্মাণ করি, এবং বিভিন্ন ব্যবহারে মাটি থেকে জল সংগ্রহ করি সেই মাটি আজ ভয়ঙ্কর ভাবে দূষিত বিভিন্নভাবে ।একই জমিতে বারবার খাদ্যশস্য বৃহৎ উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে বছরে দুই থেকে তিনবার করে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ, কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার, পারমানবিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার , কল-কারখানা থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন তরল বর্জ্য পদার্থ মাটিতে মিশে মাটিকে ভীষণভাবে দূষিত করে চলেছে । ফলে মাটির স্বাভাবিক ক্ষমতা হারিয়ে যাচ্ছে । পাহাড় পর্বত জঙ্গল শিল্পের নামে ভেঙ্গে কেটে মাটির ভয়ংকর ক্ষতিসাধন করা হচ্ছে।

এইভাবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে আমাদের অপরিকল্পিত ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ক্রিয়াকর্মের জন্য আমরা পরিবেশকে দূষিত করে চলেছি। মানুষের অজ্ঞতা ও প্রচন্ড লোভে প্রকৃতির ভারসাম্য আজ বিপর্যস্ত। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে শুধুমাত্র সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য মানুষ নিজের জীবনকেই বিপন্ন করে তুলেছে পরিবেশকে দূষিত করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় শিক্ষিত মানুষেরাই পরিবেশকে দূষিত করে সবচেয়ে বেশি। এই দূষণ এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে আর শিক্ষিত মানুষেরা সাধারণ মানুষের উপর দায় দায়িত্ব চাপিয়ে শুধু নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অজুহাত তুলে ধরে । কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা না হলে পরিবেশকে বাঁচানো যাবে না।

তবে দেশ সমস্যায় পড়লে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে অবশ্যই আসতে হবে ।পরিবেশ দূষণ এমন জায়গায় এসেছে যে সাধারন মানুষের সহযোগিতা ছাড়া পরিবেশ রক্ষা সম্ভব নয় । কিভাবে সাধারন মানুষ এই কাজে এগিয়ে আসবে ? বাড়ি থেকেই শুরু করা যাক। বাড়িতে জ্বালানিটা কম করে, কীটনাশক কম ব্যবহার করে, বাইরের খাবার কম খেয়ে, প্লাস্টিক জাতীয় ব্যবহার বন্ধ করে , সুতির পোশাকের ব্যবহার বেশি করে , বিজলির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রেখে, ন্যূনতম প্রয়োজন এর অধিক কোন কিছুই না ব্যবহার করে বাড়ি এবং তার চারিপাশে গাছ লাগিয়ে একটু শরীর চর্চা করে নিজে এবং সকলের মঙ্গল করা যায়। মিষ্টি ব্যবহার, মিষ্টি হাসি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা এবং দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন পরিবেশ সুস্থ রাখতে মানুষকে অনেক সাহায্য করে। প্রথমে আমাকেই বাঁচাতে হবে।।

প্রকৃতি বাঁচলে তুমিও বাঁচবে

গোবিন্দ মোদক

গাছপালা নদী-নালা জল হাওয়া মাটি,
সৃষ্টির আদি যুগে সবই ছিলো খাঁটি।
প্রকৃতি ও পরিবেশ ছিলো অনুকূল,
মানুষের লোভে সব হলো প্রতিকূল।
পরিবেশে বিপন্নতা এলো পৃথিবী জুড়ে,
দূষণ বসালো থাবা চেনা ছন্দ-সুরে।
মানুষের অবিমৃষ্যকারিতা অদূরদর্শিতার ফলে,
দূষণটা একে একে মাটি, বায়ু, জলে।
প্রকৃতির মহাদান সবুজ বনাঞ্চল,
নির্বিচারে গাছ কেটে পেলো প্রতিফল।
পেট্রোল-ডিজেল-কয়লা জ্বালানোর ফলে,
পরিবেশে দূষণটা বাড়ে পলে-পলে।
যথেচ্ছ রাসায়নিক সার কীটনাশকের ব্যবহার,
জমিও দূষিত হয়ে হলো অনুর্বর।
কলকারখানার ধোঁয়ায় দূষিত পরিবেশ,
বর্জ্য জল,বর্জ্য পদার্থ নদীকে করলো শেষ।
বহু মাছ, কীটপতঙ্গ তাই লুপ্তপ্রায় প্রজাতি,
নানা পাখি, বন্যপ্রাণী উধাও রাতারাতি।
দূষণ বাড়ছে যেমন বাড়ছেও রোগ,
ভারসাম্যহীন প্রকৃতিতে নানা দুর্ভোগ।
এখনও মানুষ যদি সচেতন না হয়,
পরিবেশ ও প্রকৃতির ধ্বংস নিশ্চয়।
তাই বৃক্ষরোপণ করো আর বাঁচাও পরিবেশ,
অন্যথায় প্রকৃতি ধ্বংস, সভ্যতার শেষ!!

বিশ্বগণিত

মেমসাহেব

মা বলে সময় বহুমুখী
স্রোতের সাথে সাথে বয়ে চলে নাট্যময় জীবন
জোয়ারের দিন, ভাটার রাত
তারই মাঝে কতো ব্যাকরণ
স্বরবর্ণ কম বলে ব্যাঞ্জনা শতাধিক
তাই বলে মুখের হাসি মলিন হতে দিও না
খুবই খঠিন গণিতের উত্তর কিন্তু স্বল্পই হয়
ভার কাটিয়ে পালে টান দাও, মনের গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাও সংসার-তরী
এক পলক ছুটেই ভরাডুবি।
এতো ভারি কথা আমি বুঝিনা
শুধি বুঝি আমার পৃথিবীর ইতিহাসের সেই তো ধ্রুবতারা ।

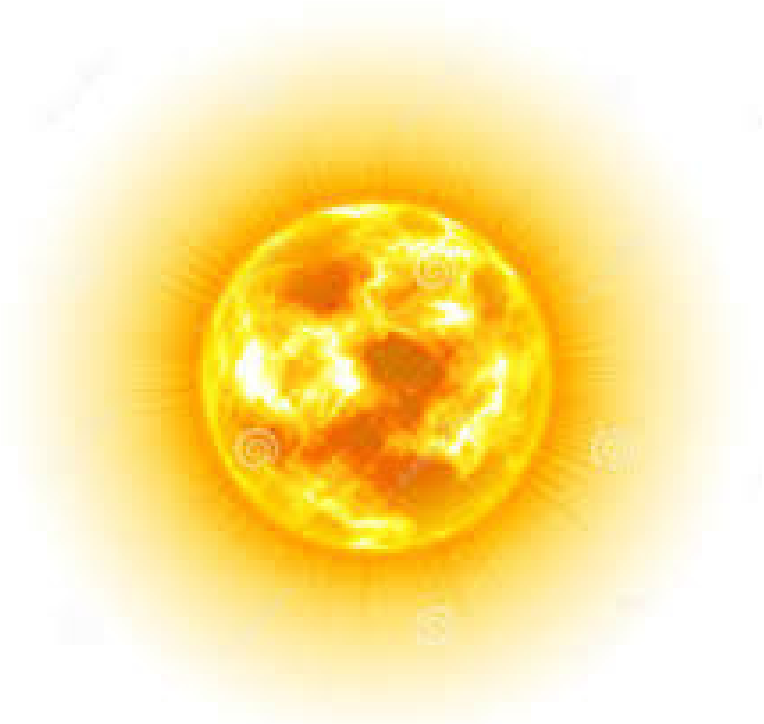

অস্তিত্বের সংকট

ঝর্ণা মুখোপাধ্যায়

পরিবেশ নিয়ে লেখার আগে মনে রাখতেই হবে, আমি দুর্গাপুর -আসানসোল অঞ্চলের বাসিন্দা ও একজন নারী। মূল বিষয় হবে এই পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল নিয়ে গড়ে ওঠা সমাজে কি ভাবে আছি।কারণ পরিবেশ ব্যস্ত থাকে মানুষের ক্রিয়া কর্ম নিয়ে ,আর মানুষের যাপনের কথা নিয়ে।এ অঞ্চলে কোথায় দূষণ নেই? কথায়,ভাষায়, শরীরের ভঙ্গীতে, শব্দে, আকাশে, বাতাসে -জলে ,গাছহীন খাদানের জঙ্গলে।সকলেই জানি, প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার সকলের কাছে সমান।গাছ দেয় খাদ্য, নিরাপত্তা, জলের আরেক নাম জীবন,মুক্ত হাওয়া দেয় সুস্থতা। এসবের কিছুই কিন্তু সবার নয় এখন। শুধুই অসাম্য আর দূষণের আওতায়। পুঁজিবাজার দখল নিয়েছে আমাদের পরিবেশ। ছড়িয়ে যাচ্ছে দূষণ। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে উঠে আসছে মানুষের অস্তিত্বের সংকট!

পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সমাজবিজ্ঞানীরা বারবার সতর্ক করে চলেছেন। বিজ্ঞান মঞ্চ গুলো সচেতন মানসিকতা তৈরিতে কাজ করে চলেছেন। আধুনিক বাজারের মানসিকতা, যেমন চলছে তেমনি চলবে ।এই বার্তাই সর্বদা ঘোষনা করে চলেছে ।রবীন্দ্রনাথ ও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "দাও ফিরে এ অরণ্য লহ এ নগর। সেই কবে থেকে শুরু, কিন্তু তার বাণী উপেক্ষিতই রয়ে গেছে আজো। কেউ ভালো নেই। স্পষ্টই উঠে আসছে সমাজতন্ত্রের কথা।

পরিবেশ নিয়ে দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। একদিকে "চিপকো" অন্য দিকে "নিয়মগিরি "আন্দোলন পৃথিবীর নজর কেড়েছে। নির্মল সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছে এই আন্দোলন পৃথিবীর মানুষকে। এতো সুন্দর কথা প্রাণ কাড়া হলেও পুঁজি শেষ কথা বলছে।এই আন্দোলনের চেহারায় আছে বাঁচার দাবি। একটা গাছ কাটার বিরুদ্ধে অন্যটি আদিবাসীদের পাহাড় জঙ্গল রক্ষার দাবি।

নারী ও শিশু অধিকারের প্রশ্ন। প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহারে, যেভাবে পৃথিবীর দূষণ বেড়ে চলেছে তা কল্পনাতীত। এরপর আছে মানুষ দূষণ।বলা হয় নারী প্রকৃতি। কিন্তু তারা সমাজের ভাবনায় সমান মর্যাদা পায়না। মেয়েরা বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। তাকে ঘিরে আছে , পণপ্রথা, অবহেলা, স্বামী আর শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার। কাজের মূল্য পুরুষের থেকে কম।ঋতুকালীন সময়ে কতো কাজ নিষিদ্ধ তারজন্য। কিন্তু একদিন ছিল নারী ঋতুকালীন সময়ে ও বাজারে যেত, কাপড়ে লাগলেও কেউ কিছু মনে করতো না। চর্যাপদের যুগ থেকে বড়ুচন্ডীদাসের সময় পর্যন্ত মেয়েরা দোকান সাজিয়ে বসত,দুধ বিক্রি করত ফিরে আসতো নির্বিঘ্নে।আজ আমাদের কাছে তা কল্পনাতীত।
এর উপর আছে বাপের বাড়ি পাঠানো, ঘরের যাবতীয় কাজ, সংসারের মন যুগিয়ে চলা, পুজো পার্বণ,উপোস, না খাওয়া। শিশুর দায়িত্ব পালন।জাত পাতের শিকার। পুরুষের কোনো দোষ থাকে না, দোষটা ঐ পরের মেয়েটার। এখনো চাকরি থেকে ফিরে মেয়েদের রান্না বান্না করতে হয় । স্বামী চা এর জন্য বসে থাকে স্ত্রীর ফেরার অপেক্ষায়। এই প্রসঙ্গে রাজস্থান, গুজরাট, পাহাড়ি এলাকার মেয়েদের সম্বন্ধেও বিস্তারিত বলা যায় যা আরো ভয়ঙ্কর ! কমবেশি সকলেই জানেন,ঐ আফ্রিকার গ্রামীন পরিবার দের কথা।

পরিবেশ নিয়ে চলছে ক্ষমতায়ন। বাড়ছে দারিদ্র্য ও পুঁজির লোভ। পৃথিবীর ৮০ শতাংশ বনাঞ্চল ছিল।আজ সরকারি হিসেবে ২০-২৩ শতাংশ বনাঞ্চল। লুন্ঠন হচ্ছে পাথর,বালি, নদীর গতিপথ শুকিয়ে যাচ্ছে, ভূগর্ভস্থ জল, পেট্রল,গ্যাস, কয়লা আকরিক লৌহ এসবই তো প্রাকৃতিক সম্পদ। এসব সম্পদ নিয়ে চলছে কাড়াকাড়ি।

দেখা যাচ্ছে বিশ্বব্যাপি এই সম্পদের অপব্যবহারে ভূমিক্ষয়, জলাশয় ভরাট, তেজস্ক্রিয় পদার্থের অমানবিক ব্যবহার! অন্যদিকে মানুষের হাহাকার। এজন্য অনিয়মিত বৃষ্টি, বনাঞ্চল ধ্বংস,কল কারখানার বর্জ্য ফেলা হচ্ছে নদীতে, কারখানার ধোঁয়া আকাশ ঢেকে দিচ্ছে। এরসাথে যুক্ত হচ্ছে অর্থনীতির সংকট। বাড়ছে দূষণের মাত্রা। ছড়াচ্ছে আতঙ্ক,ভয়, ভাষার সন্ত্রাস, রাসায়নিক ব্যবহার, বাজি ও শব্দ দূষণ। বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হচ্ছে খাদ্যদ্রব্যে ।

বাঁধ নির্মাণে নদীর গতিপথে মাটি জমে ভরাট করছে নদী বুক। নানান কারণ ছাড়াও পরমানুর ব্যবহারের জন্য ওজন স্তরের ক্ষয় হয়ে চলেছে। মাটির দখল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছি বলেই ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে দ্রুত ।এসবই তো পরিবেশের ভারসাম্য হারানোর উৎস । এরপর আছে -এই অত্যাধুনিক যুগেও আমার অতি চেনা মানুষ, তিনি বিয়ে দিয়েছেন তাঁর চোদ্দ বছরের মেয়েকে অধিক বয়সের পুরুষের সঙ্গে। তাঁর শ্বশুর ঋতুকালে ওর হাতে জল ও খায়না। যদিও তারা উগ্র ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ।

তাহলে?

অভিজাত পরিবারের আনন্দের উৎস এরাই। নারী বিজ্ঞাপনের বাজারে। তাদের পেটের জ্বালায় যেতে হয় নিষিদ্ধ পাড়ায় । মেয়েদের বিক্রি করা হয়, কাজের লোভ দেখিয়ে বা বিয়ে করে। নতুন আলোয় আলোকিত দেশে বাড়ছে বেশ্যালয়। ওরা জল আনে, পাতা কুড়ায়, নির্যাতনের শিকার হয় শিশু থেকে বৃদ্ধা।

শিশুদের খাটানো হয় লোকের বাড়িতে বা শ্রমিক হিসেবে।কেউ কেউ বাধ্য হয় চোর হতে,ভিক্ষা করতে। এমন এক দূষিত পরিবেশে নারী ও শিশুরা নানান অসুখের শিকার শুধু হয়না অজানা অসুখ বিসুখ ছড়িয়ে পরিবেশ নষ্ট করে। দূষণ নানা রূপে নানা ভাবে নারীকে বাজার জাত করেছে।

এ নিয়ে গবেষণা হলেও পুঁজিবাজার এর উল্টো কথা বলে চলেছে রঙিন আলোয় বসে। হিংসা ছড়িয়ে মানুষের বিচ্ছিন্ন মানসিকতা গড়ে তুলছে। বন্য পরিবেশে বন্য প্রাণীর অস্তিত্ব হারাচ্ছে। সমাজের নারী পুরুষ, ড্রাগের নেশায় আশক্ত। যৌবন হিংসার আগুনে পুড়ে অল্প বয়সে জীবন শেষ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

এর বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা খুব জরুরি। জনগণের উদ্যোগ গ্রহণ করা ছাড়া আর অন্য উপায় নেই।সাধারণ মানুষের কাছে কুসংস্কার দূর করতে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা এবং পুরনো ধ্যান ধারণা নষ্ট করা খুবই জরুরী।

চিরদিন সূর্য পুব থেকে পশ্চিমে হাঁটে/জ্যোৎস্নাতে তবু দেখি অপুষ্টির ছায়া/আত্ম সম্মান খোয়া যায় শৌচাগার ছাড়া/ প্লাস্টিক বন্ধ হোক /করি বৃক্ষ রোপন।/ওরাই আপন জন।

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রাখতে হলে শিক্ষা ও সুষ্ঠ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে মানুষের মানসিকতায় উন্নত চিন্তা চেতনা ও বিশ্বাসী আলো পৌঁছে দেওয়া একান্তই দরকার।

১- জল সংরক্ষণ করা ও কাছাকাছি জলাধার তৈরি করে দেওয়া।

২- মদ,ড্রাগ নেশা জাতীয় জিনিসের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা

৩- ধোঁয়া,ধুলো, যুদ্ধ এসব বন্ধ করা,বন্য প্রাণীদের সংরক্ষণ করা ও বন জঙ্গল বাঁচানো।গাছ নষ্ট করা হচ্ছে পুঁজির ইচ্ছে খুশি মতো। বাড়ছে মরুভূমি,বন্যা,খরা,

অনিয়মিত বৃষ্টির প্রভাব।

৪- শিল্পপতি দের সমস্যা সমাধানের কোনো চেষ্টা নেই। আমাদের দুর্গাপুরে ও অন্ধকার নেমেছে। দামোদর হারিয়েছে প্রাণ। আসানসোল বিপদ মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে। খাদান ভিত্তিক পরিবেশে বাড়ি ঘর মানুষ সবাই বিপন্ন। পাথরখাদানগুলো, এক শ্রেণীর মানুষের কব্জায়। নারী ও শিশুদের নিরাপত্তার অভাব।

জনগণ এগিয়ে এলে একদিন নোনা জল বন্ধ হবে। সচেতনতার অভাবে আজ পৃথিবী দুটো অংশে বিভক্ত। ধনী ও গরীব।এ কারণেই শিশু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে মা। ভৌগলিক অবস্থান পাল্টে যাচ্ছে। অরণ্যে মহুয়ার গন্ধ।হাড় বের করা শরীর কে জাগিয়ে রাখে কিছুদিন। মেয়েরা বাঁচে দুর্যোধন, দুঃশাসনের ক্ষোভ নিয়ে।

পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ এখন খুবই জরুরি। আসুন একসাথে শুরু করি পথ চলা।সোস্যাল মিডিয়া ঠিক খবর টুকু পৌঁছে দিতে বাধ্য হবেই। তাহলে ছোট ছোট উচ্চারণ, রাখবে না গভীর বিলাপ।মনের আলো বয়ে যাবে বস্তির ভেতর দিয়ে।

অনুচ্চারিত

কাকলি গুহ রক্ষিত

যা কিছু বলার ছিল
এখনো পারোনি বলতে
আধফোঁটা জুঁই বা নিভন্ত সলতে
জ্বালতে জ্বালতে ডেকে এনেছো দরাজ বসন্ত
মায়াবী মধুর জলতরঙ্গে
বেজে উঠেছে নিশিগন্ধা সুর
যা কিছু বলতে চাও এখনই বলে ফেলো
অধরা মাধুরী হয়ে আর কতকাল পাথরে মুখ লুকাবে বলো

অবিনশ্বর

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

একটা ভরাট জলাশয় হলে
তবেই একটা জঙ্গল হয় ,
সেখানে জল খেতে আসে
অন্তঃসত্ত্বা নারী পশুরা ,
আত্মরক্ষার নখরের আড়ালে
তাদের মাতৃস্তন আনন্দে মাতে ;
গাছেরা আরো ঘনিয়ে আসে
ঝিঁঝিঁ পোকা গুলো গুলতানি থামিয়ে নীরব হয়
চারিপাশে এক মায়াজাল সৃষ্টি হয়,
এইসব জঙ্গলে সভ্যতার আলো না ঢোকাই ভালো ;
সেখানে মেঘেদের সাথে কথা বলে গাছেরা
পাশাপাশি আনন্দে বাস করে ।

কবিরা যাকে গাছ বলে মনে করে
অনেকেই তার মধ্যে আসবাবপত্র দেখে
লালসার আগুনে জঙ্গলে দাবানল আসে
অক্সিজেনের অভাবে তাড়িত মানুষগুলো
আই সি ইউ এর গহ্বরে গিয়ে ঢোকে ,
কুমারী বৃষ্টির উচ্ছ্বাস যায় না তাদের কানে ।

এদিকে এই সুন্দর জঙ্গলেও
ঢুকে পড়েছে আত্মঘাতী সেনাবাহিনী
তারা বনের পর বনে
আগুন লাগিয়ে চলেছে
ধীরে ধীরে কমে আসছে
পৃথিবীর মায়াময় আলো ,
সব সৈনিকেরা একযোগে
নেমেছে খান্ডবদাহনের মহাযজ্ঞে ।

প্রকৃতির পাঠশালায় যেসব পড়ুয়ারা পড়ছে
তারা হয়তোবা বেঁচে যেতে পারে
এই ইতিহাস টুকু লিখে রাখার জন্য
সেখানে নদীবাড়ির পাশে বসে
মূর্খতার মহাকাব্য পাঠ করবে
উন্মনা মেঘ ,
ফুলেদের আবিষ্ট গন্ধে কামাতুর হয়ে গাছেরা
জড়িয়ে ধরবে একে অপরকে ,
স্নান সেরে আসবে রাত্রির চাঁদ ।

এই জঘন্য সভ্যতার শেষে
নতুন বর্ণমালা সৃষ্টি হবে
ভালোবাসার হালখাতা নিয়ে আসবে নদী
দ্রাদিমি দ্রাদিমি তালে স্পন্দিত হবে বুক
নতুন এক সভ্যতার পদযাত্রা শুরু হবে
বেদনার জঠর থেকে ।
হয়তোবা সূর্যও তখন পরিব্রাজক হবে আলোর খোঁজে ।

মৃত্যুর পরওয়ানা

কৌশিক রায়

মৃত্যুটা ঠিক কখন হয়?
চার ঘণ্টা পরে, যখন মৃত্যু সনদ দেয়?
না আরও কিছু আগে,
যখন শরীরের শীতলতা জাগে।
না কি চোখ বন্ধ হলেই?
অথবা ডাক্তার সব শেষ বললেই।
কিংবা তারও আগে মৃত্যু হয়ে যায়,
যখন রোগ যন্ত্রণায় মৃত্যুকে শরীর চায়।
বা হয়তো সেই দিন মৃত্যু হয়েছিল,
রুগ্ন শরীর যেদিন অবহেলায় বিছানায় পড়েছিল।
নয়তো যেদিন বুঝেছিল তার ব্যাধি দুরারোগ্য,
বা তার বেশ কিছু আগে, যখন সর্বস্ব ছিল ভোগ্য।

মৃত্যুটা রোজ হলে বেশ ভালো হতো,
একটা অভ্যাস হয়ে যেতো।
বদ অভ্যাস গুলো হয়তো কিছুটা কমতো,
উপার্জন ব্যয় আর সঞ্চয়ের হিসাব কষা থামতো।
সময়ের মূল্য বৃদ্ধি পেতো, দ্রব্য মূল্য না,
বিদ্বেষ আর হত্যার প্রয়োজন বোধ হতো না।
প্রতিদিনের জেগে ওঠা হোক জন্মের সূচনা,
রাতের ঘুমে নেমে আসুক মৃত্যুর পরওয়ানা।

যান্ত্রিকতা

মিলন সরকার

চলছে সবাই ছুটছে যে ভাই
লড়ছে একসাথে |
হাসছে সবাই বাসছে যে তাই
খুশি যে যাতে |

ছুটছে গাড়ী উঠছে বাড়ী
চলছে অক্লান্ত |
ধুঁকছে কেহ কুঁকড়ে দেহ
আছে তবু জ্যান্ত |

সকাল পেশা বিকাল পেশা
পেশা দিবারাত্রি |
কর্মে পেষা অর্থে নেশা
নেশাতুর যাত্রী |

আমি এক নামী দ্যাখ
এটাই শুধু লক্ষ |
যন্ত্রে হাসা মন্ত্রে বাসা
চ্যুত নিজ কক্ষ |

এগিয়ে চলা এড়িয়ে শলা
পরোয়া নেই কারো |
যুক্তিহীন মুক্তিহীন
চলো জোরে আরো |

অর্থহীন জগত অর্থ হীন |
একটাই শুধু মন্ত্র -----
টাকা কামানোর টাকা জমানোর
পূর্ণ্য একটা যন্ত্র |

ব্যস্ত এই শহর সুস্থ এই নগর
এভাবেই বেঁচে থাকা |
কত শত ভীড় শত শত নীড়
তবু নালিশ, আমি একা |

ভাঙছে সেতু হেতু-অহেতু
সবাই শহর পাণে |
বুকের পাঁজর হাজার আঁচড় ,
এ শহর; সহ্য করতে জানে |

অপেক্ষা

মিঠু মুখার্জি

কোন এক ডিসেম্বরের ভোরে
কবিতা লিখে ছিলাম তোমাকে ভেবে
ভীষণ প্রিয় ছিল সে কবিতা আমার
হৃদয়ের দেরাজে রেখেছি তা যত্নে
যদি তুমি আসো কোনদিন কোন ছলে
দু হাত ভ'রে অঞ্জলি দেব কবিতার ছন্দে।
দিন যায়, মাস যায় ,বছরও যায় চলে
তবু তুমি এলে না ফিরে এ শহরে
দেরাজ খুলে দেখি শব্দেরা ভেজা ভেজা
শুকিয়ে গেছে আবেগের- আবেশ!
এখন শুধু অপেক্ষা একফালি রোদ্দুরের ...।

সর্বগ্রাসী

মৃন্ময় ভৌমিক

একবার পিছন ফিরে দেখ, প্রতিহিংসা জ্বলছে কেমন।
লোভ লালসার যৌথ প্রয়াস, বে-ঘর করেছ যাদের, তাঁরাই খোঁজে শৈশব।
পেন, পেন্সিল, কাঠের সেলেট জ্বলে অঙ্গার।
সামনের ফাগুনে ছিল বরণডালা, নেমে আসে অকাল বৈধব্য, আলতা রাঙা পা পুড়ে কালচে।
চোখের জলে চিকচিক করে টিনের তোরঙ্গ।
মুটে, মজুর,টানা রিক্সাওয়ালা, ছাতু, পিঁয়াজ লঙ্কায় লান্চ সারে ফুটপাতে।
কেড়ে নেওয়া যা কি?

স্বাধীনতা

নিমাই বন্দোপাধ্যায়

দস্যুবিধির সব নিয়ম মেনে
ওরা এলোপাথাড়ি গুলি গেঁথে দিল চেতনায়।
ও মেয়ে, তোর মুখ দেখে নেবে পুরুষে
পাঠশালা তোর নয়, তোকে মা হতে হবে
বোরখায় ঢাক মাথা।

কাঁটাতার টপকে বিমানের বিমূর্ত চাকায়
মানুষের গায়ে মানুষ পড়ছে নিচে
কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে শিশু
একা। থাক বাছা ক্রেটে শুয়ে থাক।পরে দেখা হবে

বেড়ার ওপাশে জানি যাওয়া হবে না, যদি কেউ
বাচ্চাটাকে বাঁচান আমার। শাসক পালিয়েছে আগে।
তাকে কেউ বেত্রাঘাত করেনি জনাব!
আমি পিতা আমি মাতা আমিই ফেলেছি সন্তান।

বুকের মধ্যে মেঘ, সরাতে পারছি না
শিরায় বইছে জল, বাঁধতে পারছি না
দেশের মাটি ঝেঁটিয়ে পারছিনা জড়ো করতে স্বাধীনতা।
মনের জোর এখনো বেঁচে
স্বপ্নের উড়ানে সেটুকুই ভয়ে তটস্থ তটরেখা।

দুঃখগুলো

নীরেশ দেবনাথ

দুঃখগুলো বাঁধে যে বাসা
সবার ঘরে ঘরে
সুযোগ পেলেই এক্কেবারে
সপাটে জাপটে ধরে।

আশেপাশেই থাকে সদাই
যায় না মোটেই ছেড়ে
কান্না-হাসির সংসারেতে
হাসিকে নেয় কেড়ে।

খুশিগুলি ভয় পেয়ে যায়
লুকিয়ে থাকে লাজে
দুখের জ্বালায় সুখগুলি সব
হাসতে পারে না যে!

সুখগুলি সব দল বেঁধে আয়
দেখবি তবে বটে
দুঃখগুলো পালিয়ে যাবে
রবে না এ তল্লাটে।

ছাঙ্গু লেক

নির্মল কুমার প্রধান

ভ্রমণ কাহিনিতে আমি বিশেষ করে বাসযোগে ভ্রমণের কথা তুলে ধরেছি। দলবিশেষে সেটা সম্ভব হয়। কিন্তু কখনো কখনো দল সংগঠন না হ'লে , কয়েকজন মিলে ভ্রমণ তৃষ্ণা মেটাতে হয়।
তারই নামান্তর এই ছাঙ্গু লেক দর্শন অর্থাৎ সিকিম ভ্রমণ।

বলে রাখছি-- সিকিম ভ্রমণ বেশ কিছুদিন সময়ের ব্যাপার। কিন্তু কর্মময় জীবনে দীর্ঘ সময় বার করানো অসম্ভব ব্যাপার। তাই আমরা পাঁচজন বন্ধু বেরিয়ে পড়লাম এক সপ্তাহের লিস্ট নিয়ে। তার মধ্যে অবশ্য দুদিন রইলো দার্জিলিং। যাই হোক, এক গন্ডুষ জলেও অনেক সময় তৃষ্ণা মেটাতে হয়। সেই ইচ্ছা নিয়ে পৌঁছোলাম শিয়ালদহ স্টেশনে। অনলাইনে টিকিট কাটা ছিল।ধরলাম দার্জিলিং মেল। রাত পেরিয়ে সকালে নিশ্চিন্তে পৌঁছোলাম। ওখান থেকে শিলিগুড়ি গিয়ে পাহাড়ে ওঠার গাড়ী নিয়ে আমরা চললাম সিকিমের উদ্দেশ্যে। বিকেলের দিকে পৌঁছেও গেলাম। পাহাড়ি শহর হ'লেও ওখানকার পরিবহন ব্যবস্থা খুব সুন্দর। একটু কস্টলি হলেও যাতায়াত , হোটেল , আহার্য -সবকিছুই সহজপ্রাপ্য। ওখানে আমরা হোটেল বুক করে রাখিনি। গিয়েই হোটেল ঠিক করলাম। ঠান্ডার দেশ। যথারীতি আমরা গরমের জিনিসপত্র নিয়েছি। হোটেলে গরম জলের ব্যবস্থাও পেলাম।সঙ্গে সঙ্গে আমরা আহারাদির কন্ট্রাক্ট ক'রে নিলাম। ব্যয়বহুল হলেও ভ্রমণ পিপাসু মনকে তৃপ্ত করার জন্য সবকিছুই মেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরদিন সকাল সকাল গাড়ি করে পৌঁছোলাম পাহাড়ে ওঠার স্পটে। সেখান থেকে গাড়ি নিতে হয় সিরিয়াল দিয়ে। প্রায় এক ঘন্টা পরে সুযোগ পেলাম। গাড়িটা ছিল সেভেন সিটের। দুই জন অপরিচিত মানুষকে নিতে হল। অবশ্য কোন অসুবিধা হয়নি।

আমরা ছাঙ্গু ও বাবা মন্দিরের দিকেই রওনা দিলাম। পাহাড়ি পথ, উপত্যকা, খাদ এবং সবুজের সমারোহ দেখতে দেখতে ওপরে উঠতে লাগলাম। একসময় বহু আকাঙ্খিত ছাঙ্গু লেকে পৌঁছোলাম। বরফাকীর্ণ পরিবেশ। শান্ত -স্নিগ্ধ ঝিলের অবয়ব। পাশের রাস্তাটাতে তুষারের আস্তরন। হাতে গায়ে মাখলাম। নির্জন পরিবেশে পাহাড় , লেক, আকাশ, বাতাস নিয়ে যেন প্রকৃতি কথা বলছে। যার হৃদয় আছে সে শোনে, সে বোঝে। সেই নামকরা ছাঙ্গুকে দেখে নয়ন-মন জুড়িয়ে গেল। সার্থক হলো পাহাড় ভ্রমণের আকাঙ্খা। অবশ্য আরও দেখবার জন্য তৃষ্ণা যেন বেড়ে গেল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আরও এগোলাম। সামনেই বাবা মন্দির। তখন হঠাৎ করে বৃষ্টি এসে গেল। ওখানে গিয়ে জানলাম নাথুলা যাওয়া হবে না। কারণ , রাস্তায় ধ্বস্ নেমে পথ বন্ধ। নিরাশ হয়ে নীচের দিকে নামলাম। লক্ষণীয় যে, অতিরিক্ত উঁচুতে শ্বাসের সমস্যা হয়।

আবারও ছাঙ্গু লেকের পাশে কিছুটা সময় কাটালাম। তারপর অজস্র ধন্যবাদ ও বিদায় জানিয়ে পিছু পথে এগোলাম। খুব তৃপ্তি পেলাম। শেষ বিকেলে দোকান দানিতে কিছু কেনাকাটা করলাম। খাওয়া দাওয়া করলাম।

পরদিন স্থানীয় জায়গা ঘুরলাম। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দেখে ভালো লাগলো।

অবশেষে গাড়ি ধরলাম দার্জিলিং এর। তিস্তার পাড় ধরে চলতে গিয়ে মনে হলো যেন এক স্বপ্নময় রাজ্য।

সর্বনাশা ফাঁদ

নীতা কবি মুখার্জী

বিভৎস এই পৃথিবীতে হরেক রকমের ফাঁদ পাতা,
ভেবেচিন্তে পা ফেলো, ফাঁদে গলিও না মাথা।

মৃত্যু-ফাঁদ, বোকা বানানোর ফাঁদ, ফন্দি-ফিকির যত
মানুষ ধরার যন্ত্র যে সব আছে শত শত।

মানুষের জীবনে দুটিই প্রিয়, ছাড়া যায় না তাকে
এক হলো নেশা সর্বনাশা আর ছাড়া যায় না জীবনে ভালোবাসাকে।

ভালোবাসা দিয়ে জয় করা যায় পৃথিবীতে সবকিছু,
নেশাই হলো ধ্বংসের পথ, ছাড়ে না সহজে পিছু।

তাসের নেশা, পাশার নেশা, নেশা আছে আরও কত,
দুনিয়াতে বড়ো নেশা নাই জানি ড্রাগের নেশার মত।

সব নেশাই তো মরণের দূত, মরতে তোমাকে হবেই,
ড্রাগের নেশা ধরো না কখনো, যাহান্নামে যাবেই।

মানুষ হয়ে নেশার কবলে সঁপে দেবে কেন নিজেকে?
পৃথিবীতে এসে দাগ রেখে যাও, সঠিক বাঁচতে শিখে।

বাইজী নাচে বাই মহলে, লক্ষ টাকার ঝাড়বাতি,
সেই টাকাতেই বাঁচতে পারে হাজার শিশুর কালরাতি।

পায়রা ওড়ায়, ঘুড়ির লড়াই সবই তো নেশার ঘোরে
গরীবের রক্ত চুষেই নেশার চাকা ঘোরে বেশ জোরে।

সুন্দর এই পৃথিবীতে এসে ভালো কিছু করো "মানুষ",
সর্বশ্রেষ্ঠ জীব যে তুমি, আছে মান আর হুঁশ।

নেশায় নিজেকে বুঁদ করে রাখো, মনে আনন্দধারা,
পাশের বাড়ীর ছেলেটি হয়তো ক্ষুধায় পাগলপারা।

হয়তো কোনো দুস্থ গরীব ধুঁকছে রোগের জ্বালায়,
তোমার নেশার টাকা দিয়ে তার দূর হবে রোগ-বালাই।

তারই মুখের এতোটুকু হাসি বাড়াবে তোমার নেশা,
সেই নেশাতেই বুঁদ হতে শেখো, দেখবে নতুন দিশা।

ফাঁদে যদি পড়তেই হয় ভালোর ফাঁদে পড়ো,
জীবনটাকে সুস্থ, সবল, সুন্দর করে গড়ো।

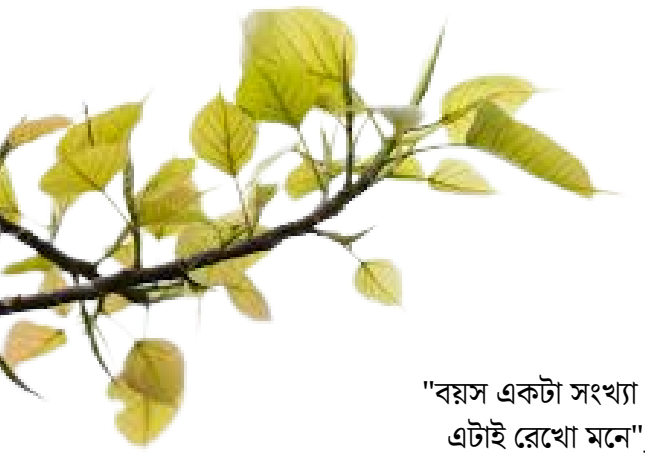

সবুজ স্বপ্ন

রঘুনাথ সিনহা

"বয়স একটা সংখ্যা কেবল,
এটাই রেখো মনে"_
এই কথাটা খুকু সেদিন
বললো আমায় ফোনে।
ষাঠ পেরিয়ে গেছি কবে
আমি ঘাটের মড়া
মানতে নারাজ খুকু আমায়
শাসন করে কড়া।
বয়সটাকে ভুলে গিয়ে
সতেজ রাখো মন
বারেবারে আর পাবে না
এমন মানব জীবন।

খুকুর কথায় চাঙ্গা হয়ে
পাবে(PUB) গেলাম ছুটে
দেখি সেথায় হাজার বুড়ো
আগেই আছে জুটে।
ডিসকো গানের সাথে ওরা
সবাই কোমর দোলায়
হাঁপিয়ে গেলে একটু বসে
হাঁটুতে হাত বোলায়।
চোখে ওদের চশমা রঙিন
কারো হাতে গেলাস
মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বলে
আছি ফাস্টো কেলাস
অজান্তে আমিও কখন
নাচ করেছি শুরু
টেরটি পেলাম বলছে যখন
চালিয়ে যাও গুরু
উদ্দীপনায় গেলাম ভুলে
বয়স বাড়ার কথা
ভুলে গেলাম প্রেশার সুগার
সঙ্গে হাঁটুর ব্যাথা

বাড়ি ফিরে এলাম যখন
মেজাজ টা ফুরফুরে
বাজছে কানে খুকুর কথা
শুধুই ঘুরে ঘুরে
বয়স একটা সংখ্যা মাত্র
মেজাজ আসল রাজা
এখন ভাবি কচি আমি
মনটা রাখি তাজা।।

সবুজ বাঁচাও

রাজশ্রী সেন

চারিদিকে প্রত্যাশীদের আকুতি একটাই
জল চাই, জল চাই, জল চাই ----
পৃথিবী পায়ে পায়ে অগ্রসর হয়েছে
আদিমতা ছেড়ে সভ্যতার উন্নয়নে।
সবুজের শিকড়কে ধ্বংস করে
সভ্যতা বাঁচাতে পৃথিবীর আয়ুকে করছে ক্ষীণ।
সূর্য হয়েছে উদ্ধত, মেঘবারিও শোষিত জীর্ণ হয়েছে জীবনের বনিয়াদ।
তৃষ্ণার্ত মানুষের চোখে বিরহ ছাইরঙা আকাশের ,
তারা জীবন কাব্যে মাখতে চায় সোঁদা গন্ধের সোহাগ।
মাটির শিরায় শিরায় না পাওয়ার ক্ষেদ,
বৃষ্টির শোণিত ধারার তীব্র উন্মাদনার।
তার জঠরে দহন জ্বালা সূর্যের লেলিহান শিখার,
সে অনুভব করে সবুজ প্রেমের সংলাপের শূন্যতা।
উন্নয়নের নেশায় হয়ো না ধ্বংসাত্মক,
সবুজের নরম বুকে সিঁদ কেটে তাকে কোরো না কঙ্কালসার।
নীল হারিয়ে আকাশ বিষাক্ত হাওয়ায় প্রগতির দৌড়ে ফেলছে নিরন্তর দীর্ঘশ্বাস।
পৃথিবীর অবয়বে দাও সবুজের ছোঁওয়া,
পিপাসার্তের হাত ছানিতে মেঘ ঝরে পড়ুক বৃষ্টি হয়ে,
সিক্ত হোক অভিমানী মাটি,
গড়িয়ে পড়ুক সৃষ্টি রসের ধারা শরীর বেয়ে।।

ঘেরাটোপ

রীতা রায়

১.

কলিং বেল বেজে উঠতেই তিন্নি চকিতে চঞ্চল হয়ে উঠলো। একই সঙ্গে চেহারায় ফুটে উঠলো অভিমান। স্কুল থেকে ফিরে অব্দি টিভিতে কার্টুন দেখে যাচ্ছে.. প্রতিদিনের একই রুটিন।

মন্দিরার গানের টিউশন দিয়ে ফিরতে ফিরতে রাত আটটা হয়েই যায়। কাল আবার রবিবার, সকাল বিকাল বাড়িতে ক্লাস আছে।
মন্দিরা ফিরতেই, কাজের মেয়েটি 'বৌদি আসছি ' ..বলে বিদায় নিলো।
ঘরে ঢুকেই মন্দিরা তিন্নির দিকে একঝলক তাকিয়ে ঘাড়ের ব্যাগটা নামাতে নামাতে বললো -- এখনো কার্টুন দেখছো , পড়তে বসবে কখন ?
তিন্নি সাড়া দিলোনা।
-- তিন্নি !
-- তোমার কথা শুনবো না, তুমি প্রতিদিন যাও কেন ? আমার একা থাকতে ভালো লাগেনা।
মন্দিরা কাছে এসে মেয়েকে আদর করে বললো --- খুব রাগ হয়েছে মেয়ের .. দেখো তোমার জন্য কী এনেছি ?
তিন্নি হাস্যোৎফুল্লভাবে মায়ের হাত থেকে ক্যাডবেরিটা কেড়ে নিয়ে বললো -- চকলেট ! আমার মিষ্টি মামনি !
-- এবার পড়তে বসো।
-- আগে বাবা আসুক।

তিন্নির বাবা, মানে তন্ময় মজুমদার যিনি নামেই এবাড়ির কর্তা তিনি পেশায় একজন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। কাজ শেষ করে পাড়ার ক্লাবে ঘন্টাখানেক আড্ডা দিয়ে ঘরে ফিরতে রাত দশটা।
কলিং বেল আবার বাজতেই বোঝা গেলো তন্ময় ফিরেছে।

-- তিন্নি, এখনো ঘুমোওনি ? শুধু টিভি দেখা .. দিনদিন বাজে হয়ে যাচ্ছ।
-- বাপি, তোমাকে যে চিপসের প্যাকেট আনতে বলেছিলাম ..কই, দাও ?
-- এই রে, একেবারে ভুলে গেছি, কাল আনবো..
-- না.. আমার এক্ষুনি চাই।

-- আচ্ছা ঠিক আছে, পাড়ার দোকান থেকে এনে দিচ্ছি.. আজ কিন্তু খাবে না , কালকের জন্য।
-- আচ্ছা।

রোববার মানে, ঘরের কাজের চাপ বেশি। তার ওপর মন্দিরার গানের স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠান সামনেই .. তারই মহড়া চলছে। উপরে উঠে আসতে বেলা দুটো বাজবে। রোববার রান্নার ভার তন্ময়ের ওপর। সপ্তাহের একটা দিন জম্পেশ করে রাঁধা আর খাওয়া। ছোটবেলার মায়ের হাতের রান্নার স্বাদ এখনো জিভে জল নিয়ে আসে .. কতকাল সেসব রকমারি রান্না খাওয়া হয় না.. ভাবতে ভাবতে মাংসটা গ্যাসওভেন থেকে নামিয়ে রাখলো তন্ময়। তিন্নি আঁকা ক্লাস থেকে ফিরে চিপসের প্যাকেট হাতে সোফায় হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে কার্টুন চালিয়ে দেখছে। মন্দিরা ধপ ধপ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাথরুমে ঢুকে পড়লো। স্নান করে ঠাকুরকে জলবাতাসা দিয়েই খাবার বাড়বে।
বিকেলও ব্যস্ততার মধ্যে কাটলো। রাতে খাওয়ার টেবিলে তিন্নিকে পাওয়া গেলো না.. সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

২.
মাঝরাতে হঠাৎ গোঙানির শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো তন্ময়ের। মন্দিরার ক্লান্ত শরীর তখনো বিছানা আঁকড়ে পড়ে রয়েছে। পাশের ঘরে তিন্নি .. গোঙানির শব্দটা ওঘর থেকেই আসছে। তন্ময় আশংকিত হয়ে তিন্নির কাছে গেলো।
-- তিন্নি, তিন্নি ?
তিন্নির চোখ দুটো বোজা, শরীরটা থরথর করে কাঁপছে.. কী যেন বলার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না, শুধু গোঙাচ্ছে।
-- তিন্নি!
ইতিমধ্যে, মন্দিরাও উঠে এসেছে ..
-- তিন্নি, কী হয়েছে মা আমার ! সোনা আমার !
তিন্নি মায়ের কোলে নেতিয়ে পড়েছে। মন্দিরা একটু গলা উঁচিয়ে তন্ময়ের উদ্দেশে বললো,
-- সারাদিন তো বাড়িতেই ছিলে, একটু নজর রাখতে পারোনি মেয়েটার দিকে ?
-- তুমি কেমন মা, নিজের মেয়েটার দিকে খেয়াল নেই .. মা হয়েছে?
-- দেখো, দোষ দেবে না ..
-- রাতের খাবারও তো খেলো না, বিকেলে কিছু খেয়েছে ?
-- আমি কী করে বলবো ? আমি কী ঘরে ছিলাম ?
-- এখন ঝগড়া করার সময় নয়, ডাক্তার ডাকি।
-- তিন্নি, টয়লেটে যাবি ? চল নিয়ে যাই ..

মন্দিরা তিন্নিকে কোলে তুলে ওয়াশরুমে নিয়ে যায়।
-- একী! টয়লেট তো হলো না দেখছি। তিন্নি, তিন্নি.. কখন থেকে টয়লেট যাওনি ? তুমি কী তিন্নিকে টয়লেট যেতে দেখেছো ?
-- আঃ , আমি কী অত লক্ষ্য রেখেছি নাকি !

-- হ্যালো, ডক্টর আগরওয়াল, আমি তন্ময় দাস বলছি, আমার মেয়ে তিন্নি.. হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে , হাত-পা ছেড়ে দিয়েছে .. মানে, প্রস্রাবও হচ্ছে না .. আপনি কী একবার আসবেন ? কী বললেন, বাড়িতে কিছু করা যাবে না ? ইমিডিয়েটলি হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে ! এত রাতে ..

তন্ময় ঘড়ি দেখলো, রাত একটা বেজে পাঁচ, এতো রাতে রিকশা পাওয়া মুশকিল, অ্যাম্বুলেন্স কল করলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তন্ময় নিচে নেমে বাইক বের করে তিন্নিকে কোলপাঁজা করে নামিয়ে আনলো.. মন্দিরাও প্রস্তুত হয়ে দরজায় তালা দিয়ে নেমে এলো। তিন্নির অবস দেহটা মোটরবাইকে তুলে জাপ্টে ধরে বাইকে উঠে বসলো।

৩.
হাইওয়ে দিয়ে গেলে দেরি হয়ে যাবে। শর্টকাট চাই .. কয়েকটি অলিগলি পার হয়ে বড়রাস্তায় উঠে কিছুদূর এগোতেই.. একী ! রাস্তায় এতো জল কেন ? এখন তো বর্ষাকাল নয়.. বৃষ্টিও হয়নি, তবে ? নর্দমার নোংরা জল রাস্তায় থৈ থৈ করছে।
বেশ কিছুদিন এই এলাকায় নর্দমাগুলো পরিস্কার করা হয় না। মিউনিসিপালিটি আর সাফাইকর্মীদের গাফিলতি। রাস্তার ধারে ধারে স্টেশনারি দোকান, খাবারের দোকান .. প্যাকেট ফুডের সম্ভারে সাজানো। চটজলদি খাবারের প্যাকেট, কফির কাপ, পানমসলার প্যাকেট, কোল্ড্রিংকস বা জলের খালি বোতল .. সবই এখন 'ইউস এন্ড থ্রো', নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহৃত জিনিসই যে তাদেরই অসুবিধার কারণ হতে পারে তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারোরই ।

প্লাস্টিক বজন করুন, পলিথিন ব্যাগ বর্জন করুন .. রাস্তায় রাস্তায় ব্যানার ঝুলছে মাত্র। সরকারের পক্ষ থেকে কতবার নিষেধাজ্ঞা জারী হচ্ছে .. ধরপাকড়, জরিমানা .. সবই দিনকয়েকের জন্য, তারপর আবার যেমনকার তেমন ! রমরম করে চলছে প্লাস্টিক জিনিসের ব্যবহার.. কেউ কখনো প্লাস্টিকের কারখানাগুলো বন্ধ করার কথা বলে না। উৎপাদন না

হলে ব্যবহার হবে কী করে ? কিন্তু, তা হবার নয়। বর্তমান যুগে প্লাস্টিক একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু.. ব্যবহারে সুবিধা, দামে সস্তা ও ওজনে হালকা হওয়াই এর কারণ। তাছাড়া, 'প্লাস্টিক' এখন প্যাকেজিংএর মূল আধার।

"উচ্চ আণবিক গুরুত্ববিশিষ্ট যৌগের সাথে বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে উচ্চচাপ ও তাপমাত্রার সাহায্যে কৃত্রিম রেজিন তৈরী করে বিভিন্ন ছাঁচে ঢেলে প্লাস্টিকের বিভিন্ন জিনিস তৈরী করা হয়।" প্লাস্টিকের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হল 'পলিথিন'। 'পলি' অর্থ্যাৎ অনেক ইথিলিনের সমাবেশ হলো 'পলিথিলিন'। ইথিলিনকে 200°C এবং 1000 বায়ুমণ্ডলের চাপে অক্সিজেন অনুঘটকের উপস্থিতিতে যৌগিক পলিমারাইজেসন বিক্রিয়ার সাহায্যে পলিথিনে পরিণত করা হয়। পলিথিন, পলিস্টিরিন, পলিভিনাইল ক্লোরাইড .. এগুলো হলো থার্মোপ্লাস্টিক যা ভীষণ নরম ও দুর্বল ফলে কম ভঙ্গুর ও জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত। এরা সরল রৈখিক পলিমার জাতীয় এবং 'রি-ক্লাইম্যাশন' পদ্ধতির দ্বারা একবার ব্যবহারের পর পুনরায় ব্যবহার করা যায়। থার্মোপ্লাস্টিকের জিনিসপত্র তৈরির সময় বারবার গরম করার ফলে বাতাসে অনেক বেশি কার্বন মিশে যায় যা বাতাসকে দূষিত করে। আবার নরম ও কম ভঙ্গুর হওয়ার ফলে পুরোনো নষ্ট হয়ে যাওয়া প্লাস্টিক মাটিতেও মিশে যেতে পারেনা, তাতে মাটির উর্বরতা নষ্ট হওয়ায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে যায়.. গাছে ক্লোরোফিলের মাত্রা কমে আসে। বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে মাটির নিচের কীটপতঙ্গদের। বস্তুতঃপক্ষে, পুরো বাস্তুতন্ত্রই এই দূষণের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে যার শীর্ষে রয়েছে মানুষ। তবে, এধরণের প্লাস্টিক যদি রি-সাইকেল করা যায় তবে ক্ষতির পরিমান কম হয় কিন্তু প্লাস্টিক শিল্প কারখানার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে সবক্ষেত্রে তা সম্ভব হচ্ছে না।

আরেক ধরণের প্লাস্টিক আছে যাকে বলা হয় 'থার্মোসেটিং প্লাস্টিক' বা 'কনডেন্সড প্লাস্টিক '। এই প্লাস্টিক ততটা ক্ষতিকারক নয় কারণ এই ধরণের প্লাস্টিকের জিনিস তৈরী করার সময় মাত্র একবারই তাপপ্রয়োগ হয় যাতে বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় গরম করলেও এদের নমনীয়তা ফিরে আসেনা। বরং নষ্ট হয়ে যাওয়া প্লাস্টিককে গরম করলে রাসায়নিক বিয়োজন ঘটে তা 'কালো কার্বন-পাউডার' আকারে মাটিতে সহজে মিশে যায়। এছাড়াও, অপেক্ষাকৃত শক্ত ও ভঙ্গুর হওয়ার ফলে নষ্ট প্লাস্টিক প্রাকৃতিক তাপেই মাটিতে মিশে যেতে পারে।
বর্তমানে দূষণ মুক্তির জন্য পেট্রোলিয়ামজাত রেজিনের পরিবর্তে উদ্ভিজ ও প্রাণীজ রেজিন বা ফাইবার থেকে বায়োপ্লাস্টিকের উৎপাদন শুরু হয়েছে যা ইকো-ফ্রেন্ডলী বলে মনে করা হচ্ছে কারণ তা খুব সহজে মাটিতে মিশে জল ও কার্বন তৈরী করে।
কমক্ষতি বা বেশিক্ষতি.. যাই হোক না কেন, মানুষের অসচেতনার জন্য ব্যবহৃত
প্লাস্টিক পথে-ঘাটে আবর্জনার মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে বিশেষতঃ পলিথিন প্যাকেট, থার্মোকলের তৈরী বাসন, পাস্টিকের বোতল ইত্যাদি। যার ফলে নর্দমার মুখ আটকে জলনিকাশি ব্যবস্থা রুদ্ধ হচ্ছে।

কেমিস্ট্রির গ্রাজুয়েট তন্ময়ের মাথায় এসব কথা গিজগিজ করলেও ..এগুলো নিয়ে ভাববার সময় এখন নয়। জলের মধ্যে জোরে বাইক চালানো যাচ্ছে না, তাই টেনে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে কোনোরকমে।
৪.
এমার্জেন্সিতে ডাক্তারী তৎপরতায় পরীক্ষা করে নাম লিখিয়ে তিন্নিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। তিন্নির নাড়ির গতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। স্যালাইন, অক্সিজেন দুইই দেওয়া হচ্ছে। মাঝে মাঝে নার্ভ পাওয়া যাচ্ছে না এবং তার কারণও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ডাক্তার বললেন -- মেন্টাল কেস.. কোনোকিছু দেখে ভয় পেয়েছে। আপনারা কী খুব বকাবকি করেন ? মেয়েকে সময় দেন না ? স্কুলে কোনো টর্চার হয়নি তো ? অথবা ভুতুরে কিছু ?
-- না,না, সেসব কিছু নয় , দিব্যি ছিল সারাদিন, হঠাৎ সন্ধ্যা থেকে ঘুমিয়ে আছে।
-- কুইক, বেবি সিঙ্ক করছে .. তাড়াতাড়ি!

সোনোগ্রাফির ব্যবস্থা করা হলো .. তলপেটের ছবি .. ভেতরটা ধোঁয়াটে, গ্যাসে ভর্তি |
-- কী খেয়েছিলো ? এতো গ্যাস কেন ?
আরে, এটা কী ? ক্ষুদ্রান্তের শেষপ্রান্তে একটা কালো স্পট। কিছু একটা আটকে আছে। তাতেই ভেতরের আবর্জনা বেরোতে পারছে না। রক্তে দূষণ বাড়ছে..
-- ওয়াশ করতে হবে, ও.টি. রেডি করুন।

তিন্নি এখন সুস্থ। যে দ্রব্যটি গুহ্যদ্বার রুদ্ধ করেছিল ..তা একটি ছোট পলিথিনের টুকরো। সেদিন দুপুরে চিপসের প্যাকেট দাঁত দিয়ে ছেঁড়ার ফলে প্যাকেটের একটি ছোট টুকরো তার পেটে চলে যায়.. আর তাতেই এই অঘটন। এ যাত্রায় রক্ষা পেলো মেয়েটা.. নইলে?
তিন্নি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। এখন সে আর চকলেট বা কুরকুরের প্যাকেটের জন্য জেদ করে না | কার্টুনও বেশি দেখেনা.. পড়াশুনায় মন দিয়েছে। মন্দিরা কিছুটা সময় রান্নাঘরে দেবার চেষ্টা করছে। মাঝে মধ্যেই মুখরোচক কিছু বানিয়ে পাতে দিচ্ছে। তন্ময় কাজ থেকে ফিরে এখন আর ক্লাবে আড্ডা দেয় না। এই সময়টা বস্তা হাতে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়.. ঘুরে ঘুরে ফ্যালনা প্লাস্টিকের বোতল, কাপ, গ্লাস, প্যাকেট, থার্মোকলের জিনিসপত্র কুড়িয়ে বস্তায় ভরে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে আসে। বাড়ি ফিরে এসে স্নান করে খেয়ে কিছুক্ষন টিভি দেখে তারপর ঘুমোতে যায়। ওর দেখাদেখি ক্লাবের ছেলেরাও ওর সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। রবিবার ও ছুটির দিনগুলিতে ওরা রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপন অভিযান চালায়। কীভাবে পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর রাখা যায় সেবিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করে সময়ে সময়ে।

স্বচ্ছ পরিবেশ মানে সুস্থ পরিবেশ.. সুস্থ জীবন.. আর এটাই আধুনিকতার মূলমন্ত্র |

একলা অমানুষ

সব্যসাচী মুখার্জি

মানুষটা আজ বড্ড একা,
চারিদিক থেকে ক্ষত-বিক্ষত
আজ সে প্রমত্ত,
তবুও ছুটে চলেছে
কেমন যেন উন্মাদের মত।

মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েও
সে যেন আজ অমানুষ,
আহত হতে হতে আজ
জীবনটা হয়ে গেছে
ঝড়ো আকাশে ওড়া
কাগজের ফানুশ।

একাকীত্ব মানুষটাকে করেছে গ্রাস
সময়ের সঙ্গে সবাই গেছে সরে -
আজ সে বড্ড বেশী ক্লান্ত,
এখন দিন কাটে তার
ধুলোমাখা পিয়ানোর সুরে।

মানুষটা বরাবরই খুব অভিমানী,
তবুও অভিমান ধুয়েছে
সময়-নদীর প্রবাহে...
শূন্যের হাত ধরেছে সে আজ
দুঃখ - স্মৃতির আবহে।

রাতের আকাশে তারা গোনা,
জলভরা চোখ নিয়ে
আবার সকাল হলে সেই পথচলা শুরু
নির্লিপ্ত, মিথ্যে হাসি দিয়ে।
রাত নাকি সব জানে,
জানে সবার গোপন খবর,
একমাত্র সেই জানে রাতের ব্যাথা...
তাই রোজ ভোরে খোঁড়ে
রাতের কবর।

জানেনা সে তার ভবিষ্যৎ
হাঁটবে সে আজ কোন পথ
জীবন-নদীর বাঁক কী হবে!
গড়বে সে কোন মনোরথ।
একসাথে কাটানো সময়গুলো
বারবার মনে পড়ে যায়;
আজ সে সত্যিই বড্ড একা -
তাই শূন্যতার দিকে চেয়ে
বসে আছে
এক অজানা গন্তব্যের অপেক্ষায়...

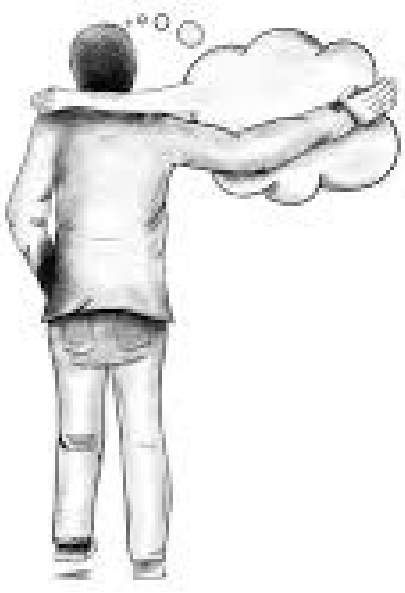

পরিবেশ রত্ন করি যত্ন

সমৃদ্ধি ঘোষ

পরিবেশ হল পরম রত্ন
করতে হবে তার যত্ন।

পরিবেশ নোংরা করবো না-
যেটা সেটা আবর্জনা ফেলবো না।

গাছ কখনোই কাটবো না-
নিজেদের বিপদ ডাকবো না।

রাশি রাশি গাছ বসাবো-
জীবজগতের প্রাণ বাঁচাবো।

জল অপচয় করব না-
আগামীতে সংকটে পড়বো না।

বাজি ফটকা ফাটাবো না-
শব্দ দূষণ ঘটাবো না।

পলিথিনের ব্যবহার ছাড়ো,
মৃত্তিকাকে রক্ষা করো।

ছুটছে গাড়ি উড়ছে ধোঁয়া-
বইছে যত দূষণ হাওয়া।

মানুষ যদি সচেতন হয়,
দূষণ মুক্ত বাতাস পায়।

অসুখ বিসুখ হবে দূর-
বইবে প্রাণে খুশির সুর।

ছোকরা

সঞ্জীব দোলুই

ঈশ্বর:- কেমন আছো হে ? কাজকর্ম ঠিক ঠাক করছো তো ?

বৃদ্ধ:- কাশতে কাশতে, প্রভু আমার বয়স আশি বছর।
এখন আবার কাজ?

ঈশ্বর:- কি বলছো হে ছোকরা? তুমি আমার বয়স জানো? আরে, ব্রহ্মাণ্ড যখন সৃষ্টি হয়নি, তখন আমি শিক্ষিত বেকার ছিলাম। তারপর তো এই কাজ-কারবার করলাম!

বৃদ্ধ:- ঠিক বলেছেন প্রভু। আপনার কাছে তো আমি একদম শিশু। তাই বোধহয় আমার নাম বিশু! আপনাকে আমার বলার কিছু নেই স্যার।
আপনি আমার কোটি প্রণাম নিন প্রভু!!

ঝগড়া দিবস

সঞ্জীব দোলুই

হাবুল রাজার দেশে সেদিন
ঝগড়া দিবস ছিল।
সভ্য দেশে দিনটা সেদিন
ভীষণ সার্থক হল।
ঘরে ঘরে মহা দুম-দাম
ঝগড়া গেল হয়ে।
গরু ছাগল কুকুর বেড়াল
পালিয়ে গেল ভয়ে।
শান্তি-প্রিয় মানুষগুলো
উঠলো বাড়ির ছাতে।
উপোস করেই কাটিয়ে দিল
দিনটা কোনোমতে।
রাজার বাড়ির সে কি জমক!
নানা রঙের খেলা।
প্রাসাদ মাঠের একধারেতে
বসল ঝগড়া-মেলা।
দেশের প্রতিভাবান ঝগড়ুটেরা
রাজার আমন্ত্রণে
সম্বর্ধনা নিল এসে
জটিল কুটিল মনে।
মহা আয়োজন প্রতিযোগিতার
সেদিন রাজার মাঠে
জিতল যে জন ঝগড়া-মোহর
বাঁধলো নিজের গাঁটে।।

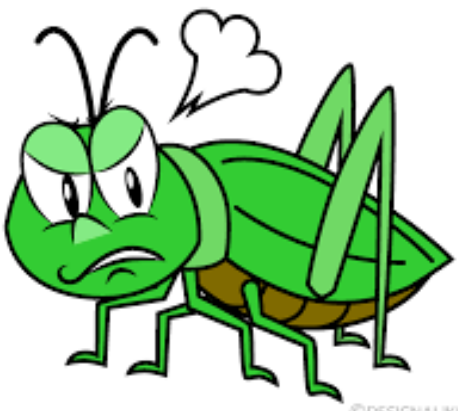

পরিবেশ দূষণ ও সচেতনতার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ

শিপ্রা ব্যানার্জি

"রোষানলে দগ্ধ হয় সভ্যতা,
সেই সভ্যতাই আলো খোঁজে"
পরিবেশকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব মানুষ্য সমাজের।
"দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর।
লও যত লৌহ লৌষট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর,
হে নব সভ্যতা।"

যে দায়িত্ব আমরা নেব আমাদের সেই দায়িত্ব হওয়া উচিত আত্মার দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা প্রেমের দ্বারা আমাদের জন্য আমাদেরই পবিত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। একটি গাছ চার জন মানুষের জীবনে অক্সিজেনের প্রয়োজন মেটাতে পারে অতএব আমরা আমাদের নিজেদের কথা ভেবেই গাছ লাগানো উচিত, গাছ লাগাবো তাকে বাঁচিয়ে রাখবো । বাঁচিয়ে রাখা উচিত নিজেদের জন্য। তাদের ধ্বংস নয়।।

দু পাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকুক সবুজ গাছের সার ।
সুখের স্বর্গ পৃথিবী ব্যাপী জুড়াক সবার শ্বাস।।"

বিজ্ঞানী ওডামের মতে-- "পরিবেশ দূষণের সংজ্ঞা হলো জল বায়ু ,মাটি ,প্রকৃতির ভৌত রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্টকে পরিবর্তনের ফলে যখন মানব সভ্যতা ,সমগ্র প্রাণীজগৎ, শিল্প এমনকি কোন প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাকে পরিবেশ দূষণ বলে।"

পরিবেশের ভৌত রাসায়নিক জৈবিক বৈশিষ্ট্যের যে অবাঞ্ছিত পরিবর্তন জীবের জীবনধারাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই হল দূষণ। যা পরিবেশকে দূষিত করে বিভিন্নভাবে--

যথা বায়ু দূষণ ,জল দূষণ শব্দ দূষণ ,মৃত্তিকা দূষণ, দৃশ্য দূষণ এবং অন্যান্য উপাদান তার জীবন জীবিকার উপর যে প্রভাব বিস্তার করে একত্রে তাই হলো পরিবেশ দূষণ।সেই পরিবেশকে যন্ত্রচালিত আধুনিক সভ্যতায় শিল্প বিপ্লব বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ভোগবাদ অতিরিক্ত ভূ পণ্য উৎপাদন অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার শিল্পায়ন নগরায়নের ফলেই প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃতির ভারসাম্য আজ বিঘ্নিত যার প্রভাব পড়তে শুরু হয়েছে মানব শরীরে ও অর্থনীতিতে।

আলোচনার মাধ্যমে এক একটা দূষণকে তুলে ধরে তার প্রতিবাদের লক্ষ্য আমাদের হওয়া উচিত। প্রত্যেকটি দূষণকে যদি আলাদা করে দেখতে চাই তাহলে প্রত্যেকটি দূষণের দিকে নজর দেওয়া দরকার।

যেমন - বায়ু দূষণ--গ্রীনহাউজ গ্যাস বিভিন্ন শিল্প কারখানা মোটর গাড়ি নির্গত গ্রীন হাউস গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড,হাইড্রোজেন সালফাইড ,সালফিউরিক অ্যাসিড,নাইট্রিক অ্যাসিড,কার্বনিক অ্যাসিড সৃষ্টি করে যা ভুমিতে পড়তে থাকে তাকে বলা হয় অ্যসিড বৃষ্টি ।এতে ঘরবাড়ি উদ্ভিদ এমনকি সমুদ্র তল ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফুসফুসে প্রবেশ কর ফলে ক্যান্সার, কয়লাগুড়ো, অ্যানথ্রাকোসিস ব্ল্যাকলাং, তুলো তন্তু ,বিসিনোসিস, এলার্জি প্রভৃতি রোগ হয়। তাছাড়া দাবানল থেকে কার্বন মনোক্সাইড আগ্নেয়গিরি ধোঁয়া উনুন, কারখানার গ্যাস ,ফলে সূর্যের যে তাপ পৃথিবীতে আসে তার সবটুকু ফিরে যেতে পারে না ফলে দিন দিন পৃথিবী উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

জল দূষণ---কৃষি কাজের জন্য বিভিন্ন রকম রাসায়নিক সার ইউরিয়া অ্যামোনিয়াম, ফসফেট ,সালফেট ,সুপার ফসফেট ,পটাশ কীটনাশক জলকে দূষিত করে ।প্লাস্টিক অক্ষত থেকে গেলে গবাদি পশুরা খেয়ে নেয়। ফলে শারীরিক ক্ষতি হয়। মানুষ ও গবাদী পশুরা একই জলে স্নান এবং ওই জল ব্যবহার করা ফলে নানান রকম রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।ফসফেট জাতীয় রাসায়নিক সার ও ডিটারজেন্ট জলে মেশার ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয় একে ইউট্রোফিকেশন বলে। শ্যাওলারা মারা গেলে জলে অক্সিজেন পরিমাণ কমে যায়, একে আলগাল ব্লুম বলে ।ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া কৃমি, জল দূষণের ফলে বৃদ্ধি পায় ।হেপাটাইটিস কলেরা, জিয়াই ডিয়া, এন্টিমিবা হিসটোলাইটিকা প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

মাটি দূষণ----পোলিও মাইলাইটিস ভাইরাস পোলিও রোগের সৃষ্টি করে উদাময় রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। ব্যাকটেরিয়া কৃমি রোগের শিকার হয় শিশুরা ,আবার কৃষির ফলন কে বাড়াতে এবং কৃষি জাত ফসলের নষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতে কীটনাশক ব্যবহার করে। তা গ্রহণের জন্য ফ্যাটের সঞ্চার হয় শরীরে।

• *শব্দ দূষণ**---ড্রাম ,বাস ,লরি তাদের ঘর্ষণ ইঞ্জিনের আওয়াজ পরিবেশ কে দূষিত করে। ফলে আমাদের শ্রবণ ক্ষমতার হাস পায় এবং বধিরতা আসে কারণ 'অর্গান অব কটির 'কোষগুলি ধ্বংস করে দেয় এই আওয়াজ। এছাড়াও শব্দ দূষণ আরো বিভিন্নভাবে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। খুব জোরে জোরে প্রচার অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করে। যেকোনো অনুষ্ঠান বা কোন পূজার সময় অতিরঞ্জিত ভাবে গান বাজনা বাজি মানুষকে খুব অতিষ্ঠ করে তোলে। বর্তমানে মিটিং, গোলাগুলি মানুষ সহ্য না করতে পারলেও বাধ্য হয় পরিস্থিতিকে মেনে নিতে এতে শারীরিক অসুবিধা সৃষ্টি হয়।
দূষণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে পরিবেশে। আকাশ বাতাস জল উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ আমাদের পরিবেশের অঙ্গ। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে তাপমাত্রা বজায় রাখতে বৃক্ষরোপণ একান্ত জরুরী ।পরিবেশ রক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের কাছে আনতে হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে গেছেন --সহজপাঠের শিশুদের থেকে শিক্ষা দান করে গেছেন। তার শিশু পাঠ্য কাহিনীতেই আমরা পড়েছি--
""আজ মঙ্গলবার পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন ""অর্থাৎ পরিবেশকে সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন রাখার ভাবনা তিনি তৎকালীন সময়ে আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। তার দায়িত্ব আমাদের হাতেই, অতএব পালন করা ও দায়িত্ব আমাদেরই।
খুবই সুকান্ত বলে গেছেন ---"এই বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি,
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।""
বেতার ,দূরদর্শন ,সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে।
বর্তমানে মানুষ অনেকটা সচেতন হয়ে উঠছেন এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা যায় শিল্পীদের হাতে এক একটি করে গাছ দেওয়া হয়। যাতে তারা এক একটি করে গাছ রোপন করে পৃথিবীর বুকে কিছুটা হলেও দূষণকে রক্ষা করতে পারে। এই অভ্যাসটা আমাদের সকলের হওয়া উচিত। আমরা যদি পৃথিবীকে গাছে গাছে ভরিয়ে দিই, শস্য-শ্যামলায় পৃথিবী যদি ভরে ওঠে তাহলে অক্সিজেনের ঘাটতি কিছুটা হলেও কমাতে পারবো। অতএব আমাদের প্রতিটি মানুষের নিজেদের এবং সমাজের কথা ভেবে প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসা উচিত।
কাঠের আসবাবপত্রের ব্যবহার কমিয়ে যদি বর্তমানে যে সমস্ত বস্তুর মাধ্যমে দামি দামি খাট পালঙ্ক তৈরি করা যায় তাহলে সমাজ থেকে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যাবে না।।
১৯৭২ সালের ৫ জুন থেকে ১৬ই জুন পর্যন্ত কনফারেন্সের ঠিক হয় জাতীয় পরিবেশ দিবস পালন করা হবে।১৯৭৪ থেকে ৫ ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পালন করা হয়---"United nation conference on the human environment " 5th Juneকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে থাকছে। শুধু পরিবেশ দিবস পালন করে নয়। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রক্ষার দায়িত্ব নিজেদের হাতেই নিতে হবে তবেই আমরা সুন্দর সবুজ পৃথিবী ফিরে পাবো।

শান্তির প্রতীক

শিখা বিশ্বাস

শূন্যতার অবগাহনে দেখা যায় নানা রঙ
ভালবাসার এক অলৌকিক ছায়া
রোজই মুখশের দাঁড়িপাল্লায় হেঁটে বেড়ায় ওজনের
মাপকাঠি
হাঁটে না সেই ছেলেটি
দু- ক্রোশ ছোটে খিদে পেটে
দুরন্ত গতিতে
এক টুকরো রুটির আশায়

চোখ ভরা জলে ট্রেনটি বিদায় দিল

চলমান সিঁড়ি থেকে উঠে এলো দুটো শান্তির প্রতীক
আশিষ নিয়ে--

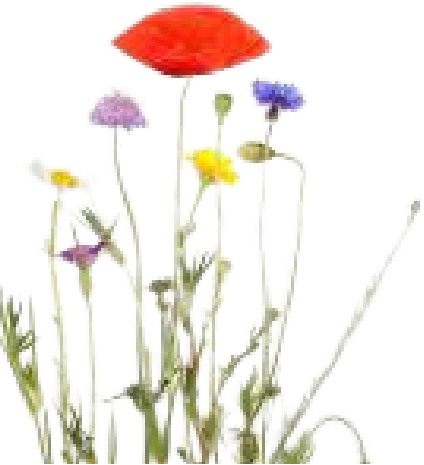

গৌতমসাধিকা সুজাতা

স্মিতা ঘোষ

সেবার স্নাতকোত্তর স্তরে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের (আর্কিওলজি) ছাত্রছাত্রী দের মধ্যপ্রদেশের একটি বিখ্যাত বৌদ্ধবিহারে গঠনশৈলী নিয়ে বিশেষ আলচনা ও কিছু ঐতিহাসিক ভাস্কর্যের সংগ্রহ দেখাবার জন্য এক্সকারশনে নিয়ে যাওয়া হল। সাথে তাদের প্রফেসররাও রয়েছেন।

অপরাজিতা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ও ইতিহাস তার ধ্যান-জ্ঞান। তাই রায়পুর থেকে ৭৭ কি মি দূরে বর্তমান ছত্তিশগড়ের মধ্যে অবস্থিত এক অন্যতম ঐতিহাসিক জনপদ সিরপুরের বৌদ্ধবিহারে যখন পৌঁছালো তখন অপরাজিতা তন্ময় হয়ে মন্দিরের দেওয়ালে আঁকা ভাস্কর্য দেখতে লাগলো। অন্য সব ছাত্রছাত্রীরা এবং অধ্যাপকেরা যখন গাইডের গল্প শুনতে ও নোট লিখে নিতে ব্যস্ত -- তখনই অপা আবিষ্কার করে ওই মন্দিরের ভিতরে বেশ কিছু মূর্তি ও ছবি, সিরপুরের বিভিন্ন এলাকায় মাটি খনন করে পাওয়া গেছে , সেগুলি সংরক্ষিত রয়েছে। ছবিগুলি মনাস্ট্রির দেওয়ালে লাগানো রয়েছে , আর মূর্তিগুলিকে বৌদ্ধমন্দিরে একটি বিশেষ স্থানে শায়িত রয়েছে। সবাই যখন এই আবিষ্কার গুলির গঠনশৈলী ও ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনারত ; তখন অপা মনাস্ট্রির দেওয়ালে একটি নারী মূর্তির ভাস্কর্য দেখে , তার গল্প জানার জন্য আকুল। একজন বৌদ্ধ লামা তাকে বলল এই প্রদীপ হাতে নারী হল সুজাতা। যে বুদ্ধদেব এর বোধিসত্ত্ব লাভে প্রধান সহায়িকা। বনের অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধদেবের সাধনাস্থলটিকে আলোকিত করে রাখতো। অপরাজিতা এই গল্পটিকে অন্তরের চোখ দিয়ে উপলব্ধি করে অত্যন্ত শিহরিত হয়ে উঠলো। এক নৈস্বর্গিক প্রেম কে সে উপলব্ধি করে মনে মনে আকুল হয়ে উঠল।
এই এক্সকারশনের দলটি সিরপুরেই একটি লজে উঠেছিল। লজটির নামটিও ঐতিহাসিক -- হিউয়েন সাঙ টুরিস্ট লজ। এই ঐতিহাসিক প্রয়োগ এর কারণ , চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৩৯ সাল এ তাঁর ভারতভ্রমণকালে এই বৌদ্ধবিহারে এসেছিলেন। সেইসময় মহানদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত সিরপুর বৌদ্ধধর্মের অন্যতম কেন্দ্র ছিল এবং উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল।সিরপুর ছিল তৎকালীন কোশলরাজ্যের রাজধানী।

যাহোক রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পর সব যে যার রুমে ঘুমোতে গেল। মেয়েদের এক একটি ঘরে চারজন করে থাকতে দেওয়া হয়েছে। অপা'র সাথে গোপা , দীপা ও রঞ্জনা রয়েছে। দুজন করে একটি বেডে ওরা শুয়েছে। অপার ডানপাশে দেওয়াল। হঠাৎ অপার ঘুম ভেঙে গেল, সে দেখতে পেল একজন সাধিকার বেশে নারী হাতে একটি প্রদীপ টিম টিম করে জ্বলছে। কিছুক্ষণ অপার দিকে তাকিয়ে তাকে হাত ঈশারা করে তার সাথে যেতে বলছে। সে উঠে বেড থেকে নেমে এল। কিন্তু ওই মহিলার সাথে যেতে গিয়ে বন্ধ দরজায় ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ধপ শব্দে ওর পাশে শোয়া রঞ্জনার ঘুম ভেঙে গেল। সবাইকে ডেকে তুলে লাইট জ্বালিয়ে দেখে অপা মাটিতে পড়ে আছে। সবাই তখন তাকে টেনে তুলে দেখে, ঘরের মধ্যে রাখা একটা টেবিলে পায়েসের বাটি। সবাই খুব অবাক হয়ে ভাবলো তবে কি সত্যিই বুদ্ধদেবের প্রিয় সাধিকা সুজাতাই এসেছিল। একটা নৈস্বর্গিক শিহরণ তাদের চারজন কে আচ্ছন্ন করে রাখলো বাকী রাতটুকু ভোরের অপেক্ষায়।

আমাদের হাতে ভবিষ্যৎ

সোমনাথ ব্যানার্জ্জী

বর্তমান ভারতবর্ষ এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। সর্বগ্রাসী দূর্নীতি, রাজনীতিকরণ, বাহুবলীদের দৌরাত্ম্য, অপসৃয়মান সংস্কৃতি, মনন-চিন্তাশীলতার দৈন্যতা আমাদের সমাজকে ভঙ্গুর করে দিচ্ছে। অপরদিকে নবপ্রজন্মের একটি অংশের অতি-আধুনিকতা, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা এবং সর্বোপরি তাদের সামনে দিশাহীনতা সমাজকে পঙ্গু করছে। অবশ্য সমাজের বৃহত্তর অংশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, সরকার, কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, আদালত এই সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সদর্থক লড়াই চালিয়ে দেশকে এই সংকট থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে।
কিন্তু কিভাবে এই পরিস্থিতি তৈরি হল ? আসুন সংক্ষেপে কিছু বিষয়কে অবলোকন করা যাক।

আবার নবজাগরণ --
রেনেসাঁ ফিরে এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার হাত ধরে সারা ভারতবর্ষে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষাক্ষেত্র প্রভৃতির সংস্কারের মাধ্যমে যে নতুন ভারতবর্ষের উদয় হয়েছিল, সেই দায়িত্ব নিয়েছে এখন বর্তমান যুবসমাজের বৃহত্তর অংশ। এখন তারাই রাজা রামমোহন রায়, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মাঠে-ময়দানে,ঝোপেজঙ্গলে, গাছতলায়, ক্লাবঘরে তারা নিরন্তর নিয়োজিত থাকে মোবাইলে, বিশ্বব্যাপি জ্ঞান আহরণে। সেই জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে তাদের ব্যবহারে, কাজকর্মে। এমনকি ভাষাতেও এত সংস্কার করছে যে এদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নিজে লজ্জিত হতে পারেন। তখন ব্রিটিশরাজশক্তি উঁনাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, এখন করেন কিছু রাজনৈতিক দাদাদিদিরা। কারন রাজনীতিতে তারা বেনোজল হয়ে ঢুকে পড়েছেন।

নিরাপত্তার সংকট--
কেউ প্রতিবাদ করেননা। ভয়ে।
হ্যাঁ, গাঁজা কেসে ধরিয়ে দেওয়ার, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার, শারীরিক-মানসিক ভাবে নির্যাতিত হওয়ার, সামাজিকভাবে হেনস্থা হওয়ার ভয়ে। তখন আইনের শাসন চালাতেন ব্রিটিশরাজেরা, এখন চালায় সরকারী মদতপুষ্ট রাজনৈতিক দলের এই বেনোজলের দাদাদিদিরা। তাদেরকে খুশি রাখলে বাড়ির মেয়েটা নিরাপদে ঘরে ঢোকে, ছেলেটা হকারি বা দোকান চালাতে পারে, কলকারখানায় একটা বারোঘন্টার অস্থায়ী কাজ জোটে। বিরোধী গণসংগঠনগুলি এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়, মার খায়, লকআপে যায় । কিছুটা সফলতা পায়। কিন্তু ক্ষমতা তো ওনাদের হাতে।

ব্যক্তিত্বের সংকট-
আপনি ডাক্তার, অধ্যাপক যাই হোন না কেন, আপনার কোন সম্মান নেই। রাজপথে লালবাতিতে আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন, আম্বুলেন্সকে আটকে দিয়ে নেতামন্ত্রীরা টাটা করে বেড়িয়ে যাবেন। সমাজে কোন অশালীন কাজের প্রতিবাদ করলে আপনার পাশে কেউ থাকবেনা। উল্টে 'সালিশী সভা'-য় আপনি হেনস্থা হতে পারেন। ট্রোল-টিটকিরি আপনার নিত্যদিনের সঙ্গী হবে। পাড়ায় একটা গুন্ডা থাকলে তার পেছনে ভয়ে সবাই দাঁড়াবে। আপনি একা কিছুই করতে পারবেননা।
অবশ্য সমাজে কিছু সাহসী মানুষ এখনো আছেন। তাঁরা আদালতে যান। লড়াই করেন। অনেকসময় জেতেনও। কিন্তু তাতে বিশাল এই দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির খুব একটা বদল হয়না।

দাদা-দিদিদের বাড়বাড়ন্ত--
চাকরি করতে গেলে নূন্যতম একটা যোগ্যতা লাগে। ব্যবসা করতে লাগে পুঁজি, বুদ্ধি ও অধ্যাবসায়। কিন্তু রাজনৈতিক দাদা হতে গেলে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগেনা।ভোটে দাঁড়িয়ে জিতলেই আয় হতে শুরু করবে। আর যদি তারপর মন্ত্রী হয়ে যেতে পারেন, তবে আপনার কথামতো চলবে উচ্চশিক্ষিত সরকারি আধিকারিকগন। আপনার হাতে টাকা থাকলে আপনি বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, বিদ্যালয়, কলকারখানা, হোটেলশিল্প, রিসর্ট প্রভৃতি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।

দাদাদিদিদের সাথে সদ্ভাব থাকলে সেই নার্সিংহোমে রুগীকে আটকে রেখে বা মেরে ফেলে বিশাল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিতে পারে, কিংবা সেই কারখানা-রিসর্টে শিশুশ্রমিক, কমবেতনে অস্থায়ীকর্মী নিয়োগ করতে পারেন। তবে আদালত থেকে সাবধানে!

মূল্যবোধের অবক্ষয়--
বর্তমান যুগ মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের যুগ। মূল্যবোধ যা কিনা মানুষকে তার যোগ্য সম্মান দেয়। আজ তা বিলুপ্তের পথে। মূল্যবোধের এই অবক্ষয়ের চরম রূপ নেওয়া শুরু হয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা থেকে । ধর্মভিত্তিক দেশভাগ ও তার পরিণামে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিটেমাটি ছেড়ে এককাপড়ে কর্পদকশূন্য হয়ে চলে আসা, চলে যাওয়া, কখনো রোষের কখনো বা করুণার পাত্র হওয়া ---- এতে তার সন্মান হৃত হয়। এরপরে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন, একটা পড়নের কাপড়, একটু রাতে শোওয়ার জমি ---- এরজন্য তাকে কঠিন লড়াই করতে হল। সমাজ তাকে বিদ্রুপ করলো। অন্যদিকে স্বাধীনতার পর থেকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি, সবুজবিপ্লব, শ্বেতবিপ্লব, হলুদবিপ্লব, সোনালীবিপ্লব, শিল্পায়ন, পন্চায়েতিরাজ, ভূমিসংস্কার প্রভৃতির সুফলে দেশে নতুন নতুন জীবিকার ক্ষেত্রগুলি খুলে যেতে লাগলো। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের নূন্যতম জৈবিক চাহিদা মেটাতে একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে ঘরের ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হল। শুরু হল অনু-পরিবার (nuclear family) তৈরির প্রবণতা। ক্রমে ক্রমে মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য কম অনুভূত হতে শুরু করলো। এখান থেকেই শুরু হল মূল্যবোধের অবক্ষয়। তেরি হতে লাগলো বৃদ্ধাশ্রম, অনাথ আশ্রম। কাশীতে, বৃন্দাবনেতে, কুম্ভমেলাতে, গঙ্গাসাগরেতে, রেলের প্লাটফর্মে, রাস্তার ধারে , বাসস্ট্যান্ডে কেউ মা বাবাকে রেখে এল, কেউ পিটিয়ে , না খেতে দিয়ে মারলো।

জাতীয় আদর্শহীনতা --
সেই হিন্দুরাজাদের আমল থেকেই ভারতবর্ষে দু'ধরনের মানুষ ছিলেন। একদল আত্মসচেতন (carrierist) -- এনারা রাজশক্তির আনুগত্যে থেকে জীবিকা অর্জন, ক্ষমতা বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যে নিমগ্ন থাকতেন। অন্যদল বিপ্লবী (revolutionist) । এরা প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, শাসনকার্য, রীতিনীতির বিরুদ্ধে যেতে চায়। এরা দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এদের সামনে থাকে একটা জাতীয় আদর্শ। উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটিশযুগে সমাজের একটা অংশ যখন বৃটিশদের থেকে শত অপমান, অবিচার, অত্যাচার সহ্য করেও তাদের পদলেহন করতে ব্যস্ত, তখন অন্যদল তাদের সিংহাসনচ্যুত করতে আমরণ লড়াই চালিয়েছিল। তখনো সামাজিক অবক্ষয় ঘটছিল ইউরোপীয় সংস্কৃতিঘেঁষা ও তাদের অনুকরণপ্রিয় প্রথমশ্রেনীর হাত ধরে। এদের কাছে দেশীয় সংস্কৃতি, শিক্ষা -- সব কুরুচিপূর্ণ ও ত্যজ্যস্বরূপ। আর দ্বিতীয়শ্রেনী ইংরাজী ভাষাশিক্ষা করেও আপন মাতৃভূমি ও সমাজের কাছে শ্রদ্ধাশীল থাকতো। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে জাতীয় আদর্শহীনতা দেখা দিল। প্রথম কিছুদিন ভারতবর্ষকে 'অনুন্নত' থেকে 'উন্নতিশীল' করতে হবে, সেই আদর্শ বিদ্যমান ছিল। পরে তাও বিলুপ্ত হল। ফলতঃ জাতীয় আদর্শহীন যুবসমাজের কাছে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটলো।

আদর্শ নেতৃত্বের অভাব --
আমাদের দেশের ইতিহাস পড়ে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারে, কত মহামানব অক্লান্ত পরিশ্রম করে, মৃত্যুবরণ করে মাতৃভূমিকে মুক্ত করেছেন। তাঁদের নৈতিক চরিত্র তাদের আকৃষ্ট করে। কিন্তু বর্তমানযুগে সেইরকম সর্বজনশ্রদ্ধেয় আদর্শপরায়ণ নেতা কই? এই অভাব দেশবাসিকে বিপথে চালিত করছে।
তাদের কাছে দেশকে রক্ষা করা, দেশের সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ রক্ষা করার জন্য কোন তাগিদ নেই। এটাই মুল্যবোধের অবক্ষয়কে তরান্বিত করছে।

সংস্কৃতির উত্তরণ --
সারা পৃথিবীজুড়ে একটা স্রোত চলছে। অনুন্নত থেকে উন্নতিশীল হয়ে উন্নতদেশে পরিণত হওয়ার স্রোত। প্রযুক্তি,

জীবনের মান, আত্মনির্ভরতা -- প্রভৃতির সাথে সাথে সংস্কৃতিরও যেন একটা উত্তরণের চেষ্টা। দেশীয় সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে প্রথমবিশ্বের দেশগুলোর সংস্কৃতিতে পৌঁছানো। তাদের খাদ্যাভাস, সামাজিক রীতিনীতি,পোষাক, জীবনযাপনকে আত্তীকরণ করা,অনুকরণ করা। তাই এখন 'ভ্যালেনটাইন্স ডে', 'গে ক্যালচার' থেকে শুরু করে 'লিভ টুগেদার' হয়ে এগিয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে নিজের বাবা-মাও কিছু বললে তা 'ভাট বকছে'!

ভাষাসন্ত্রাস --
'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান'! আশ্চর্য! তাহলে এত ইংরাজি মিডিয়াম বিদ্যালয় বাড়ছে কেন? দেশীয় ভাষার বিদ্যালয়গুলো কেন ছাত্রছাত্রীর অভাবে বন্ধ হচ্ছে? কেউ কি শুদ্ধ দেশীয় ভাষায়, যেমন ধরুন শুদ্ধবাংলায় কথা বলতে পারেন? না। মুখের বুলিতে দু'চারটে ইংরাজি না বললে আধুনিক বা তথাকথিত 'শিক্ষিত' হওয়া যায়না। চাকরি করতে গেলেও ইংরাজি চাই। রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকেই ভাষার শালীনতা রক্ষা করছেননা। তাঁদের নেকনজরে থাকা দাদাদিদিরা অনেকেই সেই ভাষাসন্ত্রাস চালাচ্ছেন।এতে সমাজে ভাষার প্রতি মুল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে।

সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি --
বিশ্বস্বীকৃত 'ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনল'-এর সর্বশেষ ২০২১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতবর্ষ '৮৫তম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ'! ভারতবর্ষের আগে ৮৪টি দেশ ক্রমান্বয়ে কম দুর্নীতিপরায়ণ। ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। সমাজের প্রতিক্ষেত্রে প্রতিক্ষনে এর শিকার সকলে। এই দুর্নীতির পিছনে অন্যতম কারণ, নাগরিক চরিত্রের দৃঢ়তার অভাব, প্রশাসনিক দুর্বলতা, বেকারত্ব, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের অপ্রতুলতা, শিক্ষার অভাব, জীবিকা-অর্জনের সংকট, ভেজাল, জনবিস্ফোরণ, রাজনৈতিক দাদাদিদির অবৈধ ক্ষমতায়ণ এবং অবশ্যই নাগরিক তথা শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবি সমাজের নীরবতা।

ধর্মীয় সন্ত্রাস --
ধর্মনিরপেক্ষ এই দেশে ধর্মীয় দাঙ্গায় মানুষের প্রাণ যায়। এরজন্য ধর্ম দায়ী নয়। দায়ী কিছু ধর্মীয় মৌলবাদী মানুষের প্ররোচনাকারী ক্রিয়াকলাপ। যে ভারতবর্ষ সারাবিশ্বে শান্তির দেশ হিসাবে প্রথম থেকে অভিনন্দিত, সেখানে এ এক চরম সামাজিক অবক্ষয়।

নেশাদ্রব্যের প্রাচুর্য --
দেশের যুবসমাজের একটা অংশ নেশাগ্রস্ত। কিছু রাজ্য মদের দোকানের ঢালাও লাইসেন্স দেয়। অন্যান্য নেশাদ্রব্যের চোরাপথের যোগানে অপরাধপ্রবণতা সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ হচ্ছে।

সোসাল মিডিয়ার বাধাহীন প্রবেশ --
সোসাল মিডিয়ার পর্দাহীন ছবি, সংলাপ, খেলা, বন্ধুত্বের কবলে পড়ে
অনেক সংসারে বিপদ ডেকে আনছে। দূরদর্শনের নিম্নমানের সিরিয়ালগুলির কুটকাচালি অনেকসময় সাংসারিক বন্ধনকে আলগা করে দিচ্ছে। অলীক জগতের হাতছানিতে বহুসময় অপরাধপ্রবণতার জন্ম দিচ্ছে, যা সুস্থ নাগরিক জীবনকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্য --
পকেটে পর্যাপ্ত অর্থ নেই। অথচ সামনে সীমাহীন ভোগ্যবস্তুর হাতছানি। তা করায়ত্ত্ব করতে পারলেই নিজের সামাজিক মান (status) বাড়ে। মা হয়তো বৃদ্ধাশ্রমে। বাবা চিকিৎসার অভাবে ধুঁকছেন। অবিবাহিতা বোনের টাকার অভাবে বিবাহ দেওয়া যাচ্ছেনা। বাড়িঘর ভেঙে পড়ছে। কিন্তু শখ মেটাতে হবে। নিত্যনতুন পোষাক, দামী গাড়ি, ইয়ারদোস্তদের নিয়ে নামী রেস্ট্রুরেন্টে পার্টি, মদের বোতল খোলা -- এ'সব না করতে পারলে কিসের আর জীবন! তাই সুপথে না পারলে কুপথেও তা অর্জন করতে হবে। এখানেই নৈতিক চরিত্রের অবনতির সাথে সাথে সামাজিক অবক্ষয় বাড়ছে।

উপসংহার --

দেশের নাগরিকসমাজ আজ দ্বিধাবিভক্ত। যে দেশে 'মায়ের দুধ' ছাড়া সবই ভেজাল, সেখানে জীবনের নিরাপত্তাকে বন্ধক রেখে সে দূর্নীতিকে মেনে নেবে, না 'এক ভারত -- স্বচ্ছ ভারত' অঙ্গীকারে এগিয়ে আসবে। মনে রাখতে হবে, 'সবকিছুরই একটা শেষ আছে'। আজও যদি আমরা এর প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ না হই, তবে পারস্পরিক হিংসায়, দ্বেষে, হানাহানিতে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। শিশু-নারীর সম্মান খুঁইয়ে, বাঁচবার নিরাপত্তা হারিয়ে নতুন প্রজন্ম খুন হয়ে যাবে। আমরা কি তাও চুপ করে বসে থাকবো। ইতিহাস এর উত্তর দেবে।

"ওঠো, জাগো, এগিয়ে চলো, যতক্ষন না অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাও।" ---- স্বামী বিবেকানন্দ।

ক্ষতের মুখে শ্যাওলা

সোমেশ ব্যানার্জী

সত্যি কথা বলতে কি, হিংসা ছাড়া থাকতে পারি না।
কথা অমৃতময়; সবার পছন্দসই যদিও নয়।
জীবন মানেই ধরে নাও একটা যুদ্ধ।
আর যুদ্ধ মানে নিশ্চয়ই অহিংসা নয়।
যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই মানব জন্ম---
চাওয়া পাওয়া মান অভিমান স্বার্থের দ্বন্দ্ব।

কার্ল মার্কস দুঃখ বোঝেননি।
বুঝেছিলেন যুক্তি, বুঝেছিলেন ক্ষত। ক্ষতে জমাট রক্ত।
অবশ্য এতদিনে ক্ষতের মুখে শ্যাওলা ধরে গেছে।
চৌকাঠ পেরিয়ে সমাধি নিমগ্ন।

উঠোন জুড়ে অমলকান্তি রোদ্দুর চায়,
চায় উঠোন ভরা জল।

উড়ন্ত ভাইরাস

সোনালী সাধু

রোজের মতোই সন্ধ্যে বেলা
যেই খুলেছি জানলাটিকে ,
কোথা থেকে উড়ে এলো
কুচকুচে এক চামচিকে ।
ঘরের গুমোট ভাব কাটাতে
স্থির করেছি মনটা যেই
ঘরে ঢুকেই করলো শুরু
নৃত্য সে যে ধেই ধেই ।

চারটে মানুষ সবাই আমরা
ভীষন তখন ব্যস্ত!
প্লেনের মতো আসছে ধেয়ে
যেন সে খড়্গহস্ত ।

এদিক ওদিক দেওয়াল , ফ্যানে
ধাক্কা খাচ্ছে জোরে
পরক্ষনেই উঠে আবার
সজাগ হয়ে ওড়ে ।
মেয়ে ভয়ে ঘাড়টি গুঁজে
পড়লো আমার বুকে
সাহসী মা আমি তখন
জড়িয়ে তাকে ঝুঁকে !
মেয়ের বাবার প্রবল সাহস
বিশাল চাদর হাতে ,
রক্ষাকর্তা হয়ে আসেন
চামচিকে তাড়াতে ।
সবাই ভয়ে জড়সড়
গুনছি প্রহর তখন
মানে মানে চামচিকা টা
বিদায় হবে কখন ।
শাশুড়ি মা ও ভ্যাবাচ্যাকা ,
করবেন কি আর
সবার সাথে উনিও তখন
হলেন রুদ্ধ দ্বার ।
চামচিকাটা জানলা দিয়ে
হলো নিরুদ্দেশ
এক ঘণ্টার কুরুক্ষেত্র
যুদ্ধ হলো শেষ ।

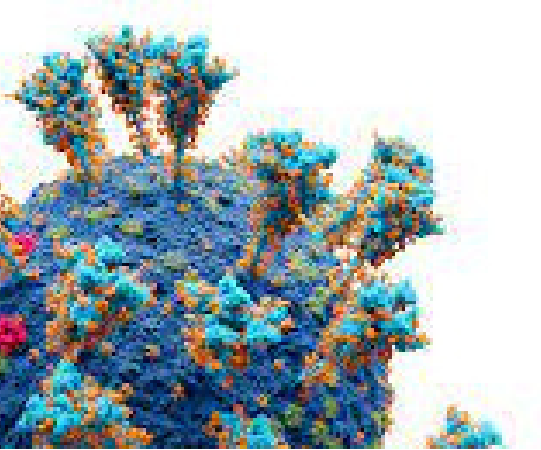

পরিহাস

সৌভিক ঘোষ

আজকাল উদাসীন ভাবটা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। তবে নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি দিন দিন। প্রতিদিনের একঘেয়েমি জীবনযাপনে হাঁপিয়ে উঠেছে প্রাণ। মুক্ত বাতাস, অরণ্যসুলভ নিস্তব্ধতায় মাঝসমুদ্রে ভাসমান নৌকার মতন জলতরঙ্গের ন্যায় সময়ের ঠেলায় বয়ে যেতে মন চায়। পারিপার্শ্বিক অস্থিরতা, মানসিক স্বপ্নলোকের দেওয়ালে আঘাত হানছে প্রতিক্ষণে। জীর্ণ হয়ে উঠেছে সে দেওয়াল। আর ক্ষমতা নেই তার, সবকিছু সহ্য করে নেওয়ার। 'বর্তমান' কে অবজ্ঞা করে অজানা ভবিষ্যৎ এবং ফেলে আসা অতীতের দ্বন্দ্ব দানা বাঁধছে আমার ভেতরে। মানসিক অস্থিরতা, অমানসিকভাবে চেপে ধরেছে আমায়। নির্লিপ্ত প্রকৃতির মানসিকতার লোকদের এই এক সমস্যা, বাহ্যিকভাবে সমস্ত কিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও, মানসিক দ্বন্দ্বের কোনো প্রতিকার থাকে না তাদের কাছে। একটুখানি আশ্রয়ের আশায় অসহায়তার সিঁড়ি ভাঙতে যখন প্রতীত হয়, যে এ পথ কেবলই অন্ধকারের দিকে যায়, তখন সে পথে এগোনোরও উপায় থাকে না, আবার ফিরে আসার প্রবৃত্তিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। স্বল্প স্মৃতির কল্প-বৃক্ষে এক নতুন ফুলের প্রস্ফুটন ঘটে । মিশ-কালো রঙের ফুলটি আশ্চর্যজনক ভাবে সমস্তকিছু শোষণ করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। সমস্ত দুঃখ-রাগ-ঘৃণা সহ্য করে নিতে পারে ফুলটি। সময়ের সঙ্গে তার রঙ আরো ঘনীভূত হতে থাকে। জীর্ণ হৃদপিণ্ডের প্রতিটি ফাটলে জমে থাকা রক্তবিন্দুগুলি একত্রিত হয়ে জন্ম দেয় অনাবশ্যক অস্থিরতার। অসহায় অতীতে টেনে নিয়ে যায় তা। স্মৃতির চিলেকোঠা হতে কুঁড়ে বার করে, স্থিতিশীলতার প্রলেপ পড়ে যাওয়া অস্থির ভাবনাগুলি। পুরনো ক্ষত-র দাগ আবার সতেজ হয়ে ওঠে। অগ্নিদগ্ধ ম্যাগমাস্তূপের গহীন তলদেশে জলমান লাভারুপ বেদনাগুলো মাথাচারা দিয়ে ওঠে। সামাজিকভাবে নিজেকে সরিয়ে ফেলতে গিয়ে মধ্যরাতের দুঃস্বপ্নগুলো শারীরিক আকার ধারণ করে; অসহায়তার মাঝে একমাত্র সঙ্গী হয়ে বেঁচে থাকার ইন্ধন জুগিয়ে যায়।।

এসো পৌষ

শ্রাবণী মুখার্জী

সোনালী রঙের মেলা শুরু হচ্ছে ধানকাটা ,
সোনা রোদের ছায়া সুনিবিড় প্রাকৃতিক শোভাটা ।
চোখের সামনে ভেসে ওঠে এই মনোরম দৃশ্য ,
নতুন স্বাদের খবর দেবে আমার ভবিষ্য ।
ফসল কাটার এসেছে সময় আসবো নিয়ে ঘরে ,
পরম মমতায় জড়াজড়ি করে বাঁধবো আঁচল পরে ।
নবান্নে আমার নতুন সংসার মা লক্ষী ভরবে ,
পৌষ পার্বণে গড়বো হাতে পিঠার মেলা হবে ,
যত্নে থাকুক আমাদের পরিবার সোনালী রঙের ঢেউ ,,
খুশির জোয়ারে ভাসা আটকাতে পারবে না আর কেউ ।
শূন্য পথিক মানিক মাঠে দুজনে মিলে ফিরে ,
বীচ ছড়িয়ে খেলনাবাটি রচবো নতুন করে ।
আবার সেই কিশোর সবুজ আসবে খবর আসার ,
এক্ চিলতে রোদ্দুরে ভরে গেল মন আমার ।।
এসো পৌষ যেও না তুমি জনম জনম থাকো ,
উষ্ণ নরম সুগন্ধী ছোঁয়া হৃদয়ে স্পর্শ রেখো ।।
প্রকৃতি ও পরিবেশ আমাদের পরিবারের অংশ ,
সুন্দর রেখো পরিবেশ যত্নে থাক শরীর নইলে ভগ্নাংশ ।।

খেলতে খেলতে

শ্রাবণী মুখার্জী

বাগানের এককোণে সুদীপ আপনমনে গান গাইতে গাইতে মাটি খুঁড়ে একটা ছোট্ট চারা গাছ লাগাচ্ছে .. টে
"ছোটো ছোটো গাছ আর ছোটো ছোটো ফুল ,
তুমি যে সুন্দর যষ্ঠি মুকুল " ।
আচ্ছা দীপ তুই যে পড়াশোনা না করে এখানে সময় নষ্ট করছিস কাকিমা দেখলে কিন্তু পিঠের চামড়া তুলে নেবে -- ভারিক্কি চালে শিক্ষক মশাই এর স্বরে বললো বন্ধু শিবু ।
একগাল হেসে দীপ বলল .. 'প্রতিদিন অনন্ত একটা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে ভালো কাজ করতে হয় তাতে ভগবান খুব খুশী হোন ,-মা বলেছেন রে ।
ও তাই নাকি ? তা তুই বাগানে সারা গা কাদায় ভরিয়ে সময় নষ্ট করছিস এতে কি ভালো উদ্দেশ্য আর কি কাজ শুনি ?

' এই একটা ছোটো গাছ হাজার প্রাণের রক্ষাকবচ ,
একদিন বিশাল মহীরুহ হয়ে কতো ভাবে আমাদের সাহায্য করবে জানিস ?
দাঁড়া একটু জল দিই ...
এই গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয় যার জন্য আমরা বেঁচে আছি , ফল দেয় যা আমাদের আহার , ফুল দেয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফোটায় , পাখি সব এই গাছেই তাদের বাসা গড়ে , কতো পাখির আশ্রয় দেয় এই গাছ , তাদের কলতান সারা পৃথিবীর মানুষ শান্তি পায় জানিস ?
সবুজে সবুজে ভরিবে দেশ ,জমকালো হবে পরিবেশ '" বুঝলি !

দীইইইইইপ .....
কোথায় রে তুই ?
এই রে কাকিমা ...
চল চল পালাই
না রে আমি যাবো না তুই যা
মা আসুক বকুক আর মারুক যাই হোক না কেন আমি জল দিয়ে চারপাশে বেড়া দিয়ে তারপর যাবো ।
নইলে গরু ছাগলে এই কচি প্রাণ কচিপাতা খেয়ে নেবে ।কচি পাতা ওদের আহার কাজেই কোনো দোষের না , রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের ।
মা বলেছে নিজের দায়িত্ব নিজেকেই বহন করতে হয় ,তাতে গুরুত্ব বোঝা যাবে নিজের কাছে ।

ও তোরা দুইবন্ধু মিলে এখানে গল্প গুজবে ব্যস্ত ? তাই আমার ডাক কর্ণকুহর এ প্রবেশ করে নি ?
না মানে না কাকিমা ,,
বিশ্বাস করো আমি অনেকক্ষণ থেকে দীপকে বলছি যে চল যাই এবার পড়তে বসবো । কাকিমা ডাকছে সেটাও বলার পর ও দীপ নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত তাই আর কি..
থাক হয়েছে সোনা
কোনো প্রমাণ দিতে হবে না , আমি দেখতে পাচ্ছি তোরা দুজন পরম যত্ন নিয়ে কি ভাবে পরিবেশ সচেতন নাগরিক হয়ে উঠছিস । তোরা বড়ো হয়ে আমাদের মুখ ,আমাদের দেশ ,আমাদের ভাষা
সবকিছু ই রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবি ।
এই বিশ্বাস এর বীজ বপন আজ নিজের চোখেই দেখলাম ।আয় সোনা বলে দুজনের মাথায় স্নেহ চুম্বন এঁকে দিলেন মা পরম মমতায় ।
মায়ের আদরে দীপবাবু গদগদ হয়ে আদুরে গলায় বললো ' জানো মা .. শিবু না বড্ড ভীতু '
শিবু কাঁচুমাচু মুখ করে কাকীমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ।

' না রে সোনা শিবু তোর গভীরতা ছড়াতে চায় কিন্তু তোকে আগলে রেখে , যাতে তোর কোনো বিপদ বা অসুবিধা না হয় ।অনেকটা বড়োদাদার মতো ' ।
শিবু খুশিতে উজ্জ্বল মুখ গুঁজে দিলো আবার কাকীমার আঁচলে ।
মা বললেন এই যে সূর্য যেমন আমদের প্রিয় রক্ষকবজ , সূর্য আলো আমাদের পরিবেশের অন্ধকার দূর করে , আবার সূর্যের আলোয় রান্না ও হয় সোলার প্যানেল কুকার দ্বারা , তেমনি শিবু তোকে সব দিক থেকেই রক্ষা করে সোনা ।
ততক্ষণে বাবা বাগানের গেটে দাঁড়িয়ে দুর থেকে ওদের সুখকর অনুভূতি র আবেগে ভেসে যাওয়া মুখ দেখছে । সত্যি , পৃথিবী তে 'মা ' হলেন পথের দিশারী ,একমাত্র মা ই পারেন সন্তান কে সঠিক দিকে চালনা করতে , সু -শিক্ষায় শিক্ষিত করতে । খেলার ছলে জীবনের মূলমন্ত্র মায়ের দান ।।

চলো সবুজ শহর গড়ি

সুমিতা চৌধুরী

আমরা যখন স্বেচ্ছা নির্বাসনে বন্দী ছিলাম,
ঠিক তখনই প্রকৃতি মেলেছিল তার ডানা,
দূষণহীন স্বাতন্ত্রের অবসরে।
স্বচ্ছ হচ্ছিল তার নির্বাসিত, নিজ রচিত শিল্প,
যেন পূর্ণাবয়ব চিত্র ফুটে উঠছিল নয়া ক্যানভাসে।
তবু তার মনের অলিন্দে ক্ষত ছিল গভীর,
তাই সে রোষে ফেটে পড়ছিল অহরহ, পড়ে আজও,
প্রচন্ড তেজে, রুদ্র তাণ্ডবে আঘাত হানে মানবসভ্যতার উপর।
আমরাই পারি তাকে শান্ত করতে,
রাখতে অমলিন তার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যকে,
করতে নবজীবন দান, প্রকৃতি তথা মানবসভ্যতাকে,
বিলাসবহুল জীবনযাত্রকে খানিক লাগাম টেনে,
আবর্জনার পাহাড় নামিয়ে,
রাসায়নিকের প্রয়োগ কমিয়ে,
প্লাস্টিক বর্জন করে।
চলো গাছ লাগাই, তোমার আমার ছাদে, বারান্দার টবে, রাস্তার ধারে,
সবুজ হোক শহর।
বাসা বাঁধুক পাখি আপন নীড়ে,
দিনগুলি হোক মধুর, সুন্দর,
পাখির কলকাকলিতে ঘুম ভাঙা এক ভোরের আলিঙ্গনে।
প্রকৃতি হোক শান্ত, নিজ বৈচিত্র্যতায় সুন্দর চির সবুজ,
সকল ঋতু তার নিজ রূপ মাধুরীতে দেখা দিক আবার এই ধরার 'পরে।
বুক ভরে নির্মল শ্বাস নিয়ে বাঁচি তুমি- আমি,
তোমার- আমার হাতে গড়া সবুজ শহর যে, ভীষণরকম দামী।।

প্রকৃতি

স্বপন কুমার ধর

সময় যে চলে নিজের গতিতে,
যায় না তো তাকে রোখা,
নদী ও যে চলে আপন মেজাজে,
যায় না তাকে ও বোঝা।

ভক্তির মাঝে দেবতা যে থাকে,
যায় না তো তাকে দেখা,
অনুভব করি,বিশ্বাস করি,
'তিনি যে আছেন' - এ কথা।

প্রকৃতির মাঝে পর্বত ও আছে,
রহিয়া দন্ডায়মান,
পৃথিবীর বুকে নদী ও যে চলে,
ধরিয়া আবহমান।

মেঘ ভেসে চলে আকাশের বুকে,
ঝরায়ে বৃষ্টিধারা,
খাল-বিল সব,জলে ভরে যায়,
প্রাণীকূল হয় আত্মহারা।

শ্বাসকার্য চলে,বায়ু বহে চলে,
দোলা লাগে মনেপ্রাণে,
সূর্যের আলোয়,আলোকিত এ ধরা,
শস্য শ্যামল হয় বসুন্ধরা।

Fill in the personal details form to be a part of Kolpomanos Foundation

কল্পমানস Foundation
An involvement is just an initiation

Personal Details Form

Paste recent Passport size coloured Photo of Applicant

1. Name : .....
2. Son/Daughter of :.....
3. Address : .....

   .....

   City/Village:.....District:.....

   State :.....PIN:.....
4. Mobile No(s):.....
5. Email ID: .....
6. Academics : ..... 7. Gender: □Male □Female □Other
8. Date of Birth: ...../...../..... 9. Nationality : .....10. Occupation: .....
11. Emergency Contact Information: .....

Application for: □Trustee Member □Volunteer □Patron □Supporter □.....

.....

Signature of the Applicant

Date: ...../...../..... Place:.....

.....

Signature with stamp of Authoriser

Join As Volunteer:

We are in need of people who want to grow with us, have a passion for the Environment or wish to have a cultural impact or love to help others socially. Join in hand with us as a volunteer and enhance your expertise with the pleasure of being a part of the different programs to keep our environment clean.

Please visit www.kolpomanos.org.in for more details

কল্পমানস Foundation

An involvement is just an initiation